[আমাদের ছুটি - ১৮শ সংখ্যা]

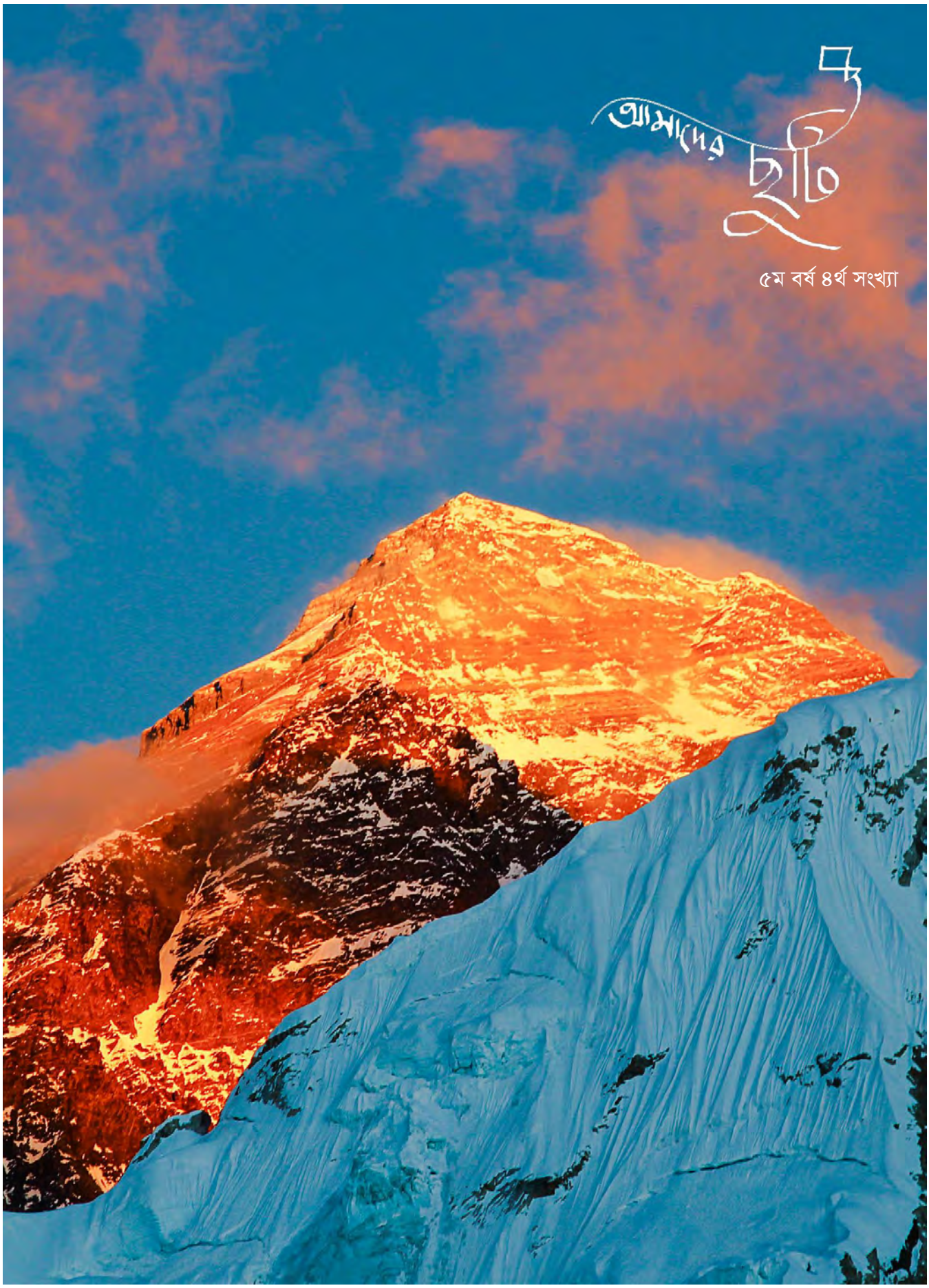

সূর্যাস্তের আগুনে রাঙা এভারেস্ট - আলোকচিত্রী- শ্রী শুভজিত চৌধুরী

~ ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা - মাঘ ১৪২২ ~

দৃশ্য এক

আমাদের ফ্ল্যাটের সামনের রাস্তা পাকা হচ্ছিল। রাস্তার ওপারে যে পেয়ারা গাছটায় একদিন একটা ছেঁড়া ঘুড়ি লটকে ছিল, আর বারান্দা থেকে দেখে আমি দু-লাইন লিখেছিলাম, সেই গাছটা কাটা পড়েছে। একটি বৃক্ষের হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, অথচ আমরা কেউ কিচ্ছু বলিনি। অসহায় গাছটা মড়মড় শব্দে নুয়ে পড়েছিল ক্রমশঃ। পাড়ার লোকে পেয়ারার জন্য আফশোস করছিল, ওদিকে তখন গাছটা ভেঙে পড়ছিল টুকরো টুকরো হয়ে।

দৃশ্য দুই

একটা চিৎকার শুনে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, মাঝবয়সী দুটো বউ, হাতে অল্প কয়েকটা জামাকাপড়, 'আমাদের কিছু জামাকাপড় দাও গো..., ও মা, বৌদিরা, আমাদের ঘর ভেসে গেছে...'- দু'হাত মাথার ওপরে তুলে অনেকটা গৌরাঙ্গ ভঙ্গীতে চাইছে। বাড়ি কোথায়, জিজ্ঞাসা করলে একজন জানায়, 'সুন্দরবন, ঘর ভেসে গেছে মা'।

বিষ্ণু দে-র 'পরবাসী' কবিতা মাথায় ঘুরছে -

জঙ্গল সাফ, গ্রাম মরে গেছে, শহরের
পত্তন নেই, ময়ূর মরেছে পণ্যে।
কেন এই দেশে মানুষ মৌন অসহায়?
কেন নদী গাছ পাহাড় এমন গৌণ?

মাথায় আটকে গেল বাক্যটা - 'কেন নদী গাছ পাহাড় এমন গৌণ?' আসলে সাধারণ মানুষ ও তার জীবন গৌণ হলেই বাকি সবকিছুও গৌণ হয়ে ওঠে ক্রমে। সবই যদি গৌণ তবে আমাদের বাসভূমিই বা কোথায় হবে? কোথায় যাব আমরা জীবনে বা ভ্রমণে? তাঁবু বওয়াই সার হবে যে শুধু সারাজীবন।

বাপ্পাদার লেখা 'বনবিবি বেত্তান্ত' পড়তে পড়তে ভাবছিলাম, বনবিবি, দক্ষিণ রায় - দেবতা যেখানে প্রকৃতপক্ষে মানুষ, তাঁরা কেউই বাঁচাতে পারবেন না সুন্দরবনের মাটি, অরণ্য, ভূমিপুত্রদের। সভ্যতা ধ্বংস করবে, গ্রাস করবে যাবতীয় কিছুকে। বাউল-ফকির মেলায় গিয়ে ধর্ম এবং জাত-পাতের বিরুদ্ধে এই সাধারণ মানুষগুলোর লড়াই করে বেঁচে থাকার কথা শুনছিলাম গানের আবহে। যত বিভেদ আর দূরত্ব বাড়বে ততোই ভাঙবে বাসভূমি, মরবে মানুষ।

ভ্রমণ কখনোই শুধুমাত্র কতিপয় সুখী মানুষের অবসরযাপন ক্রিয়া নয়, কোনোদিনই তা ছিলও না। সার্থক এবং সম্পূর্ণ ভ্রমণ কাহিনির পেছনে থাকে একটা বৃহত্তর সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। যা বহন করে সেইসময়ের ইতিহাসকেও। 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' হলে হয়ত 'আমাদের ছুটি' অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাবে। কিন্তু তার আগে যে ভূমি এবং ভূমিপুত্রদের স্বাভাবিক জীবনে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন, শিক্ষার প্রয়োজন, আর্থিক সেই ভারসাম্যের প্রয়োজন যা তাদের অবসর দেবে, ভ্রমণ করার মানসিকতা তৈরি করবে, তৈরি করবে মানসভ্রমণে আনন্দ পাওয়ার সময় ও সুযোগ। যে মানুষ খেতে পায় না, যার বাসভূমি নেই, যার শিক্ষা নেই সে কী করেই বা বেড়াবে আর কী করেই বা পড়বে?

নতুন বছরে নতুন নতুন জায়গায় বেড়ানোর পাশাপাশি আমাদের পুরোনো পৃথিবীটাকে নিজেদের জন্যই একটু বেশিদিন ভালো রাখার চেষ্টা করতেই পারি তো সকলেই একটু হলেও।

ভালো থাকার শুভেচ্ছা সব বন্ধুদের।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

জীবনে প্রথমবার ট্রেকিং করতে গিয়ে ঘুরেছিলেন হেমকুণ্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুণোত্রী। ফিরে এসে ডায়েরির পাতায় লিখে রেখেছিলেন ভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা।

- সুবীর কুমার রায়ের ভ্রমণ ধারাবাহিক 'হিমালয়ের ডায়েরি'-র এবারে সপ্তম পর্ব - কঠিন পথে গোমুখে

~ আরশিনগর ~

বনবিবি বেত্তান্ত - তপন পাল

আরশিনগরে - দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ সব পেয়েছির দেশ ~

মুন্সিয়ারির আত্মীয়তায় - সুমন্ত মিশ্র

আমাদের ছুটি - ১৮শ সংখ্যা

সাতকোশিয়ার অরণ্যে - পল্লব চক্রবর্তী

ক্রৌঞ্চদ্বীপ কুমারকোমে
- মণিদীপা বন্দোপাধ্যায়

মাল্ভির সৈকতে - হিমাদ্রী শেখর দত্ত

~ ভুবনডাঙা ~

এভারেস্ট বেস ক্যাম্প - পথের ডায়েরি
- শুভজিত চৌধুরী

আমার দেখা চিন - শ্যামলেন্দুবিকাশ সরকার

~ শেষ পাতা ~

রুপোলি রেশি আর সোনালি সিলারি গাঁও -পল্লব ব্যানার্জি

রাঙামাটির দেশ ঝাড়গ্রামে - পলাশ পান্ডা

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com ● Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - হিমালয়ের ডায়েরি (অষ্টম পর্ব)

আগের পর্ব - অতিকষ্টে লঙ্কা ও গঙ্গোত্রী

কঠিন পথে গোমুখে

সুবীর কুমার রায়

~ গোমুখের আরও ছবি ~

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

ট্রাভেলার্স লজ, পুলিশ স্টেশনের পাশ দিয়ে রাস্তা এগিয়ে চলেছে সুদর্শন ও গণেশ শৃঙ্গের দিকে। মাধব ও দিলীপকে এগিয়ে যেতে বলে গঙ্গোত্রী মন্দিরের সামনের দিক থেকে খানকতক ছবি নিলাম। কেন জানিনা, গঙ্গোত্রী মন্দিরের গঠন শৈলীতে কোথায় যেন একটা মুসলমান স্থাপত্যের নিদর্শন বা মিল আছে বলে মনে হল। সঙ্গের সেই রামের বোতলের ছিপিটার আবার প্যাঁচ কাটা। কাঁধের ঝোলা ব্যাগে একবার কাত হয়ে পড়ছে, একবার বেঁকে যাচ্ছে। পলিথিন ব্যাগ ওটাকে যত্ন করে মুড়ে রাখা সত্ত্বেও, সামান্য তরল পদার্থ ব্যাগে পড়েছে। এটা আবার এক অতিরিক্ত বোঝা। তবু ওটাকে হাতছাড়া করতেও পারছি না। কল্যাণদার উপদেশ, রাত্রে ঘুমোবার আগে এটা সামান্য পরিমাণ ওষুধের মতো খেলে, ভাল ঘুম হয়, সমস্ত ক্লান্তি দূর হয় এবং পেট পরিষ্কার হয়। তাছাড়া নাকি ঠাণ্ডা লেগে শরীর খারাপ হলে এটা মহৌষধের কাজ করে। আমরা এতদিন ধরে এত পথ ঘুরে আসছি, কোনও কাজে তো লাগল না। ধীরে ধীরে অনেকটা পথ পার হয়ে, আমরা একটা বিরাট ঝরনার কাছে এসে হাজির হলাম। এখানে রাস্তা বেশ চওড়া। ঝরনার পাশে বসে দোকান থেকে কিনে নিয়ে আসা পুরী ও তরকারি খেলাম। মাধব এক ডোজ ওষুধও খেয়ে নিল। ওয়াটার বটলে জল ভরে নিয়ে, গুটিগুটি পায়ে আবার এগিয়ে চললাম। কোথাও কোনও লোকজন নেই। সঙ্গে রোদচশমা ছিল, উজ্জ্বল রোদ্দুরে বরফের ঝলকানি থেকে চোখ বাঁচাতে। দিলীপের চশমা আছে, চোখের পাওয়ারও অত্যন্ত বেশি। যার জন্য একই পাওয়ারের একটা কালো কাচের চশমা বানিয়ে এনেছে। আজ সে তার নতুন কালো চশমা পরে দিলীপ কুমারের স্টাইলে হাঁটছে। বাকিরা রোদচশমা ছাড়াই এগোচ্ছি। রাস্তা এখানে বেশ সরু। বাঁদিকে খাড়া পাহাড়, ডানদিকে গভীর খাদ। বহু নীচে গঙ্গা। এতটা পথ এলাম, এখনও পর্যন্ত একটা লোকও চোখে পড়ল না। গঙ্গোত্রী থেকে ভুজবাসা প্রায় পনের কিলোমিটার পথ। ওখানেই লালবাবার আশ্রম। তার আগে কোনো বিশ্রাম নেওয়ার বা থাকার জায়গা নেই। ভুজবাসা থেকে গোমুখ তিন কিলোমিটার রাস্তা।

অনেকটা পথ চলে এসেছি। রাস্তা বেশ সরু হলেও, রক্ষণাবেক্ষণ ভালভাবেই করা হয় বলেই মনে হয়। এক জায়গায় একটা বেঞ্চমতো দেখে একটু বিশ্রাম নিতে তিনজনে বসলাম। ভয় ভয় ভাবটা এখন আর নেই। একটা কিরকম অদ্ভুত আনন্দ ও উত্তেজনা, মনের সেই জায়গাটা দখল করে নিয়েছে। বহুদূরে সাদা বরফের চূড়া দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে গঙ্গার ওপারে একটু দূরেও একটা পাহাড়ের চূড়ায়, হাল্কা বরফের আস্তরণ। বেশ কিছুটা পথ হাঁটলাম। প্রথমে আমি, একটু পিছনে মাধব, সব শেষে দিলীপ। হঠাৎ মাধবের ডাকে চমকে উঠে পিছন ফিরে দেখি, দিলীপ কপাল চাপড়ানোর মতো ভঙ্গিতে লাঠিতে ভর দিয়ে নীচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে একটা ভয় হল, ওর যদি এখানে এখন শরীর খারাপ হয়, তাহলে কী করব? এগোনো, পেছনো বা থাকা কোনোটাই সম্ভব হবেনা। কী হয়েছে মাধবকে জিজ্ঞাসা করায় ইশারায় জানেনা বলল। দিলীপকেই জিজ্ঞাসা করলাম তার কী হয়েছে, মাথা ঘুরছে কিনা? উত্তরে দিলীপ যা বলল, তাতে আমারই মাথা ঘোরার যোগাড়। ওর চশমাটা জামার পকেট থেকে রাস্তায় কোথায় পড়ে গেছে। যখন আমরা বেঞ্চ থেকে উঠে আসি, তখন আমি খুব ভালভাবে দেখে নিয়েছিলাম কোন কিছু পড়ে আছে কিনা। এটা আমার চিরকালের অভ্যাস। কাজেই চশমা হয় তার আগেই কোথাও পড়েছে, নয়তো সেই বেঞ্চ থেকে এখানে, যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তার মধ্যে কোথাও পড়েছে। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম বেঞ্চে বসার সময় চশমা পকেটে ছিল কিনা। বলল, লক্ষ্য করে নি। চশমা ছাড়া ওতো প্রায় অন্ধ। দিনের বেলা নাহয় পাওয়ার দেওয়া কালো চশমা পড়ে চলে গেল, কিন্তু রাতে? একটা চশমার জন্য ফিরে যেতে হতে পারে ভেবে, ওর ওপর এত রাগ হচ্ছে যে মনে হচ্ছে, যা হয় হোক, ওকে ফেলে এগিয়ে যাই। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, এত অসাবধানে কিভাবে নেয়? মাধবের শরীর এখন আগের থেকে অনেক ভাল। ঠিক করলাম ফেলে আসা বেঞ্চ পর্যন্ত খুঁজে দেখব। তাও কি একটুখানি পথ? অনেকটা রাস্তা পার হয়ে এখানে এসেছি। তাছাড়া এখান থেকে বেঞ্চের মধ্যে কোথাও যে পড়েছে, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? ওর ব্যাগ ভাল করে ঘেঁটে দেখলাম, সেখানে পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে আমি বেঞ্চের দিকে এগোলাম। আমার একটু পিছনে দিলীপ। ভরসা একটাই, রাস্তায় চশমা পড়লেও, কেউ কুড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার, বা না দেখে চশমার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। ওর ভাগ্য ভাল, না আমার জানিনা, একটু এগিয়েই দেখলাম চশমাটা রাস্তার ওপর পড়ে আছে। ভাগ্যিস, খুব বেশি পিছোতে হয়নি বা মোটা কাচ বলেই বোধহয়, পাথরের ওপর পড়েও ভাঙেনি। চশমাটা কুড়িয়ে নিয়ে দিলীপের কাছে এসে ওর হাতে দিয়ে বললাম যত্ন করে ব্যাগে তুলে রাখতে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে, আবার এগিয়ে চললাম। রাস্তা এখানে কোথাও কোথাও অসম্ভব সরু। এইভাবে অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসে অনেক দূরে, বহু নীচে গঙ্গার পাশে, একটা টিনের ঘর দেখতে পেলাম। চারপাশে অনেক গাছপালা দিয়ে ঘেরা। মনে হয় এটাই চিরবাসা। এরপর তাহলে ভুজবাসা। প্রায় দশ কিলোমিটার পথ চলে এসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই চিরবাসা পৌঁছে গেলাম। মাধবকে বললাম যত ঠাণ্ডাই পড়ুক, লালবাবার আশ্রমে এই রামের বোতল নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। ঠিক করলাম এখানে পাথরের আড়ালে কোথাও রেখে দিয়ে যাব। আর একটু এগিয়েই, একটা বেশ বড় পাথরে লাল রঙ দিয়ে "VIMAL" লেখা আছে দেখলাম। দু'দিকে যতদূর চোখ যায়, কোন লোকজন চোখে পড়ল না। রাস্তার পাশে একটা ছোট্ট গর্ত, অনেকটা গুহার মতো হয়ে আছে। সামনে ছোটবড় অনেক পাথর। একটা বড় পাথর সরিয়ে, তার পিছনে বোতলটা সোজা করে রেখে, পাথর দিয়ে আড়াল করে, আমরা আবার এগোলাম।

গোমুখের পথে

হঠাৎ মাধব আমাকে আকাশের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, "ওটা কী বলতো"? কোথাও কিছু দেখলাম না। ওর চেষ্টায় একটু পরেই জিনিসটা দেখতে পেলাম। এখন বেলা প্রায় দশটা। সমস্ত আকাশ একেবারে পরিষ্কার নীল। মেঘের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সূর্যালোক জ্বলজ্বল করছে। ডানদিকে পাহাড়ের একটু ওপরে, তারার মতো কী একটা জ্বলজ্বল করছে। বরফ নয়, কারণ পাহাড়ের উচ্চতা জিনিসটার অনেক নীচে শেষ হয়ে থেমে গেছে। মেঘ নয়, কারণ কোথাও এতটুকু মেঘ নেই। তাছাড়া ওখানে অতটুকু এবং তারার মতো গোল ও উজ্জল মেঘ হবে না। পাখি নয়, কারণ ওটা একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। ঘুড়িও নিশ্চয় নয়, কারণ ওটা স্থির ও উজ্জল। তাছাড়া ওই শৃঙ্গ জয় করে, ভারতের জাতীয় পতাকা ওড়াবার শখ কারো মনে আসলেও আসতে পারে, কিন্তু ঘুড়ি ওড়াবার চিন্তা পাগল ছাড়া কেউ করবে না। তাহলে ওটা কী? কোনও তারা? দিনের বেলা রোদ থাকলেও অনেক সময় চাঁদকে দেখা যায় দেখেছি, কিন্তু তারা? কাউকে বললে আমাদের পাগল বলবে। শেষ পর্যন্ত ওটা কী পদার্থ বুঝতে না পেরে, এগিয়ে যাওয়াই উচিৎ বলে মনে হল। খানিকটা এগিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই পিছন ফিরলাম। বস্তুটা একই জায়গায়, একই ভাবে জ্বলজ্বল্ করছে। হঠাৎ মনে হল এই রাস্তায়, পিছন দিকে ঘুরে তাকিয়ে হাঁটা উচিৎ নয়। বন্ধুদেরও ওইভাবে হাঁটতে বারণ করে, দৃষ্টি সামনে ফেরালাম। রাস্তা এখানে কোন কোন স্থানে, বারো থেকে আঠারো ইঞ্চি মতো চওড়া। বাঁপাশে নরম ঝুরোমাটির উঁচু পাহাড়। তাতে ইতস্ততঃ ছোট বড় পাথর। ডানদিকে তরোয়াল দিয়ে এক কোপে কাটা হয়েছে, এরকম প্রায় সমান খাদ নেমে গেছে বহু নীচে গঙ্গায়। পড়ে গেলে ধরবার মতো একটা ছোট আগাছা পর্যন্ত নেই। মাঝেমাঝে, যদি পা পিছলে যায় ভেবে, বাঁপাশের পাহাড়ের দেওয়ালে হাত রেখে, খুব সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। এখানে রাস্তাও ধুলোয় ভরা, খুব মজবুত বলে মনে হয় না। এতক্ষণে উল্টোদিক থেকে একটা আদিবাসী গোছের লোককে আসতে দেখলাম। তাকে তারার মতো জিনিসটা দেখাবার চেষ্টা করলাম। মিনিট পাঁচেক চেষ্টার পরেও, সে দেখতে পেল না। আমারও আর দেখাবার ধৈর্য রইল না।

চিরবাসা

আরও বেশ কিছুটা এগিয়ে দেখলাম, কিছু লোক রাস্তা পরিষ্কার করছে। এবার একটা ব্রিজ পার হয়ে, গঙ্গার আরও কাছে গেলাম। বোধহয় অন্য কোন ছোট নদীর ওপর দিয়ে ব্রিজটা পার হতে হয়। ব্রিজটা পার হয়েই, বড় বড় অনেক পাথর ফেলা একটা জায়গায় এলাম। কোন রাস্তা নেই। যে রাস্তায় এতক্ষণ হেঁটে আসছিলাম, সেটা ব্রিজ পর্যন্ত এসে হঠাৎ থেমে গেছে। এপারে কোন রাস্তা চোখে পড়ছে না। মাধবকে এদিকটা একটু দেখতে বলে, পাথরগুলোর ওপর উঠে, রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করলাম। চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও, এপারে কোনও রাস্তা দেখতে পেলাম না। নীচে ডানদিকে, মাধবও কোন রাস্তা আবিস্কার করতে পারলো না। নীচ থেকে দিলীপ চিৎকার করে আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, কী করবে? এত রাগ হল কী বলব। কী আর করবে, একটাই তো কাজ করবার আছে, সেটা রাস্তা খুঁজে বার করা, এবং সেটা নিজেদেরকেই করতে হবে। কারণ এখানে কাছেপিঠে কোথাও কোনও লোক নেই। এতক্ষণের এই বার-তের কিলোমিটার পথে, একজন আদিবাসী ও কয়েকজন কুলি গোছের লোকের দেখা মিলেছে, সেও বেশ কিছুক্ষণ আগে। নীচের দিকে নেমে এলাম এবং হঠাৎই খুঁজে পাওয়া গেল, বেশ চওড়া রাস্তাটা। আসলে ব্রিজ পার হয়েই আমরা পাথরগুলোর ওপর রাস্তা খুঁজছিলাম। পাথরফেলা পাহাড় জাতীয় উঁচু ঢিবিটার পিছন দিক দিয়েই আবার রাস্তা গেছে। মাধব ও দিলীপকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম। দূরে একটা ছোট্ট সাঁকো। ওটার ওপারে গিয়ে ওদের জন্য একটু অপেক্ষা করলাম। ওদের আসতে দেখে, আবার এগোলাম। হাঁটার ইচ্ছা ও আনন্দ যেন ক্রমে কমে যাচ্ছে। আর এইভাবে হাঁটতেও ভাল লাগছে না। একটু দূরে রাস্তার ওপর একটা দোকান বলে মনে হল। বেশ জোরে খানিকটা এগিয়েই বোঝা গেল, ওটা আসলে একটা বড় কালো পাথর। অপেক্ষা না করে সামনে এগিয়ে চললাম। মাধবরা অনেক পিছিয়ে পড়েছে। দেখতেও পাচ্ছি না। বাঁপাশে কাত হয়ে ধুলোর পাহাড় উঠে গেছে। যেন ধুলো জমা করে করে ওটাকে উঁচু করে তৈরি করা হয়েছে। আমাদের এখানে যেমন বালি রাখা হয়। তবে এর উচ্চতা অনেক, এবং সেই ধুলোমাটির পাহাড়ে ইতস্ততঃ প্রচুর ছোট বড় পাথর। হঠাৎ দেখলাম একগাদা পাথর গড়িয়ে রাস্তা পার হয়ে, খাদে চলে গেল। পাথরের আঘাতে মৃত্যু না হলেও, মাথা ঘুরে বা গড়িয়ে পড়া পাথরের ধাক্কায় খাদে চলে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। এই রকম বিপজ্জনক রাস্তাটা বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত গেছে, এবং সেখান থেকে অনবরত পাথর গড়িয়ে পড়ছে। আসলে একটা ছোট পাথর সরে গেলেই, পরপর ব্যালেন্সে আটকে থাকা সব পাথর, লাইন দিয়ে নেমে এসে, চোদ্দ-পনের ইঞ্চি রাস্তা পার হয়ে, গভীর খাদে গঙ্গার বুকে আশ্রয় নিচ্ছে। মাধবদের এ জায়গাটায় সতর্ক করার জন্য, দাঁড়িয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ পরে ওরা এল। ওদের জায়গাটা দেখিয়ে বললাম, খুব তাড়াতাড়ি, পারলে ছুটে জায়গাটা পার হয়ে যেতে। প্রথমে আমি, আমার পিছনে দিলীপ, সবশেষে মাধব। একটু এগোতেই মাধব আমার নাম ধরে চিৎকার করে উঠল। পিছনে না তাকিয়েও বুঝলাম ব্যাপারটা কী। জোরে ছুটে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে দেখলাম, বেশ কিছু ছোট বড় পাথর ওই জায়গা দিয়ে গড়িয়ে নীচে নেমে গেল। বাঁপাশে ঠিকমতো লক্ষ্য রাখা হয় নি, একটুর জন্য চরম বিপদের হাত থেকে মাধবের জন্য রক্ষা পেলাম। মনে মনে ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার এগিয়ে চললাম। আস্তে আস্তে ওদের থেকে আবার অনেকটা এগিয়ে গেলাম। ঠিক করলাম আর কোথাও বিশ্রাম নেবার জন্য দাঁড়াব না। দেখি ভুজবাসা পৌঁছনো যায় কিনা।

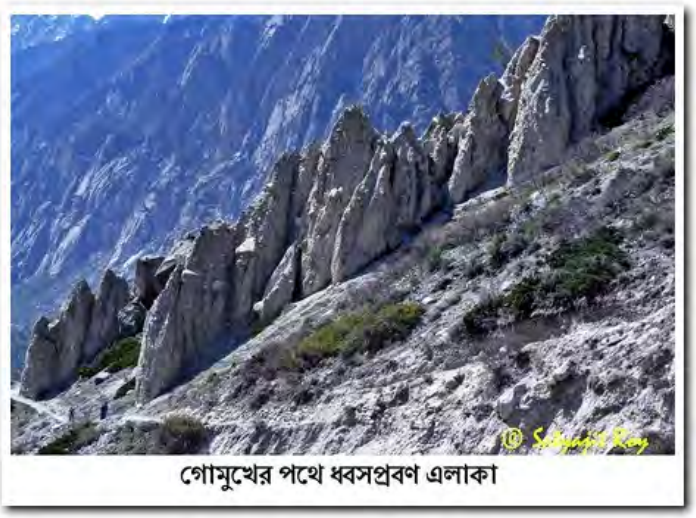
গোমুখের পথে ধ্বসপ্রবণ এলাকা

লালবাবার আশ্রমের কোন চিহ্নই চোখে পড়ছে না। এবার রাস্তা হঠাৎ নীচের দিকে গাংগানী-ডাবরানীর রাস্তার থেকেও বেশি অ্যাংগেলে নেমে গেছে। ছুটে নামতে শুরু করলাম। সরু রাস্তা, ছুটে নামায় যথেষ্ট ঝুঁকি আছে, তবু কম কষ্টে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে। এইভাবে অনেকটা রাস্তা ছুটে নেমে এসে ওদের জন্য দাঁড়ালাম। ওরাও বেশ জোরেই নেমে আসতে শুরু করল। তবে মাধব ওর পায়ের ব্যথাটার জন্য ভালভাবে নামতে পারছে না। একটা বাচ্চা ছেলেকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, লালবাবার আশ্রম আরও এক কিলোমিটার দূরে। আসলে "ভুজবাসা ০ কিলোমিটার" মাইল স্টোন, বেশ খানিকটা আগেই দেখেছি। কিন্তু লালবাবার আশ্রম ঠিক ভুজবাসায় নয়, ভুজবাসা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। গোমুখ থেকে দুই-আড়াই কিলোমিটার আগে। পিছনদিক থেকে একজন অল্পবয়সী সাদা ধুতি সার্ট, সাদা চাদর, সাদা পাগড়ি পরিহিত সাধু এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। ভদ্রলোকের হাঁটার গতিবেগ, আমাদের থেকে অনেক বেশি। তিনি জানালেন, লালবাবা তাঁর আশ্রমে নেই। গতকাল তিনি গঙ্গোত্রী গেছেন। ওখান থেকে একটা কাজে হরশীল যাবেন। কাজ না মিটলে, তিনি উত্তরকাশী যাবেন। কথায় কথায় জানতে পারলাম, ইনি লালবাবার গুরুভাই, বদ্রীনারায়ণের ওদিকে কোথায় থাকেন। এখন ইনিই আশ্রম দেখাশোনা করবেন। ভদ্রলোক এবার এগিয়ে গেলেন। বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে, বাঁদিকে রাস্তা বেঁকেই নজরে পড়ল অনেক নীচে টিনের একটা লম্বা ঘর। ওটাই লালবাবার আশ্রম। রাস্তার ওপর বাংলায় লেখা একটা বোর্ড "লালবিহারী দাসের আশ্রম"। আশ্রমের বাঁপাশে সবুজ সবজির খেত। আমরা সোজা রাস্তা ধরে নীচের দিকে নেমে, আশ্রমে এসে পৌঁছলাম।

বিরাট জায়গা নিয়ে আশ্রম ও সবজি খেত। আশ্রমের প্রায় মাঝখান দিয়ে নালার মতো কাটা। নালাটা দিয়ে ঝরনার জল বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাটির মেঝে, মাঝখান দিয়ে মধ্যে মধ্যে খুঁটি পুঁতে পুঁতে, দু'ভাগে ভাগ করা। একদিকে ছোট্ট মন্দির, অপর দিকে কাঠের আগুনে রান্নাবান্না, হাত সেঁকা চলছে। খুঁটির ওপাশে চটের ওপরে অনেক লোক বসে আছে। সেদিকে গেলাম। এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, গঙ্গোত্রীতে পুলিশের কাছে নাম, ঠিকানা লিখে এসেছি কিনা? বললাম ওখানে কেউ ছিলেন না। ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা সাদা কাগজের টুকরো বার করে, আমাদের তিনজনের নাম, ঠিকানা লিখে দিতে বললেন। বুঝলাম ইনি পুলিশের লোক। জানা গেল, সমস্ত পান্ডা ও কিছু পুলিশ গেছে সত্যনারায়ণ প্রসাদের শেষকৃত্য করতে। একজন একটা বাঁকাচোরা অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে, এক গ্লাস করে গরম চা দিয়ে গেল। চা বললে বোধহয় ভুল বলা হবে, এই মুহূর্তে এটাকে অমৃত বলাই উচিৎ হবে। বললাম, এখনই গোমুখ ঘুরে আসতে চাই। লালবাবার গুরুভাই বললেন, খাওয়া দাওয়া করে যেতে। তবু বললাম, খেয়ে উঠে হাঁটতে কষ্ট হবে, বরং ঘুরে এসেই খাব। তিনি বললেন, অল্প কিছু না খেয়ে যাওয়া উচিৎ হবে না। বাধ্য হয়ে খেয়ে যাওয়াই ঠিক হল। পুলিশের লোকটি আমাদের বার বার সাবধান করে দিয়ে বললেন, অন্তত আধ মাইল দূর থেকে গোমুখ দর্শন করতে। ওখানকার অবস্থা মোটেই ভাল নয়। এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে। যে কোন সময় আবার বিপদ হতে পারে। কথা না বাড়িয়ে বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে, তাই হবে। এবার আমাদের বাঁকাচোরা অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত ও ডাল, খেতে দেওয়া হল। অল্প করে খাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এই ভাত আমার দু'দিনের খাবার। বাধ্য হয়ে বলতেই হল, এত ভাত খেতে পারবো না। গুরুভাই বললেন, খুব অল্পই ভাত দেওয়া হয়েছে, খেয়ে নিন, তা নাহলে শরীর খারাপ হবে। আমরা আবার বললাম, এত ভাত এখন খেতে পারব না, ফিরে এসে বরং আবার খাব। ভদ্রলোক একটা খালি থালা নিয়ে আসলেন। আমরা তিনজনেই বেশ কিছুটা করে ভাত তুলে দিয়ে খুব অল্পই ভাত নিলাম। কিন্তু শেষে দেখি তাও আর খেতে পারছি না। ফ্যানসুদ্ধ ভাত, অল্প খেলেই পেট ভরে যায়। দিলীপ অবশ্য লক্ষী ছেলের মতো সব ভাতটা দিব্বি খেয়ে নিল। ওই নালার জলেই থালা ধুয়ে দিলাম। এই জলই এখানে পান করা হয়। একটা ব্যাগে এক প্যাকেট খেজুর পুরে নিয়ে, ওয়াটার বটল ও লাঠিগুলো নিয়ে, বাকি দুটো ঝোলা ব্যাগ খুঁটিতে টাঙিয়ে রাখলাম। গুরুভাইকে বললাম, "রাস্তায় প্রয়োজন হতে পারে ভেবে, আমরা কিছু শুকনো চিঁড়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। কাজে লাগেনি। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, ওটা রেখে দিতে পারেন"। ভদ্রলোক বললেন, এখানে কোন কিছু দিয়ে যেতেও মানা নেই, প্রয়োজনে নিয়ে যেতেও মানা নেই। চিঁড়ের প্যাকেটটা তাঁর হাতে দিয়ে বোঝামুক্ত হলাম। লালবাবার কথা অনেক পড়েছি, অনেকের কাছে অনেক শুনেওছি। এত কষ্ট করে তাঁর আশ্রমে এসেও, দেখা হল না, তাই মনে একটা দুঃখ থেকেই গেল।

গোমুখের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সবজি বাগানের মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা পেরিয়ে ওপরের সেই বড় রাস্তায় পড়লাম। লালবাবার একটা টিনের বোর্ডে রাস্তার নির্দেশ দেওয়া আছে। একটু এগিয়েই দেখলাম কয়েকজন পুলিশের লোক গোমুখের দিক থেকে আসছে। কাছে এলে তাঁরা সাবধান করে দিয়ে বললেন, আমরা যেন অনেক দূর থেকে দেখি আর সাদা পতাকার পরে আর না যাই। আরও পরামর্শ দিলেন, যেন ওপর দিয়ে না গিয়ে গঙ্গার পার দিয়ে যাই, এবং বড় পাথরের ওপর ছোট ছোট পাথর রেখে রাস্তায় চিহ্ন রেখে রেখে যাই। তাহলে ফিরবার সময় রাস্তা চিনে ফিরে আসতে কোনো অসুবিধা হবে না। তাদের সমস্ত কথায় সায় দিয়ে আমরা এগোলাম।

ভুজবাসা - পিছনে ভাগিরথী শৃঙ্গ

ভালই রাস্তা, তবে প্রায় দেড় কিলোমিটার মতো এগিয়েই রাস্তা শেষ। একটু দূরেই সাদা বরফের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ওখান থেকেই গঙ্গার জন্ম। এবার রাস্তা মানে বড় বড় এলোমেলো পাথর ফেলা। প্রায় প্রত্যেক বড় পাথরের ওপরেই ছোট ছোট পাথর রাখা। আগে যারা যারা এপথে এসেছে, যাত্রা পথের বড় পাথরের ওপর ছোট পাথর থাকুক বা না থাকুক, ওদের কথা শুনে বাধ্য ছেলের মতো নিজেরাও ছোট পাথর সাজিয়ে চিহ্ন রেখে গেছে। ফলে এটাই এখন সব থেকে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারিদিকে খুব কম সংখ্যকই বড় পাথর আছে, যার ওপর ছোট পাথর রাখা হয় নি। যাহোক, এখানে রাস্তা বলে কিছু নেই। পাথরের ওপর পাথর, তার ওপরে আবার পাথর ফেলে ফেলে, কেউ যেন এই রাস্তা পাহাড় তৈরি করার চেষ্টা করেছে। অনবরত পাথর গড়িয়ে পড়ে, এই রাস্তা বা পাহাড়ের নতুন রূপ তৈরি হচ্ছে। আবার পাথর গড়াচ্ছে, আবার নতুন সাজে সাজছে। আমরা আগের রাখা পাথরের চিহ্ন লক্ষ্য করে, সাদা শৃঙ্গের দিকে এগোলাম। এইভাবে আধ কিলোমিটার বা তার কিছু বেশি পথ পার হয়ে, সাদা পতাকাটা দেখতে পেলাম। পাথর সাজিয়ে তৈরি, বড় একটা ঢিবির মতো জায়গার ওপরে, লাঠির মাথায় পতাকাটা উড়ছে। পাথর বেয়ে ওপরে উঠলাম। দিলীপ ও মাধবকে বললাম অপেক্ষা করতে। এদিক দিয়ে যাওয়া সত্যিই বেশ শক্ত ও ঝুঁকির ব্যাপার। বন্ধুরা আমাকে আর এগোতে বারণ করছে। ওরা কিন্তু ওখান থেকে এখনও গোমুখের আসল রূপটা দেখতেই পায় নি। কিন্তু ঢিবির ওপর

পতাকাটার কাছে গিয়ে, চোখের সামনে গোমুখের রূপ দেখে, না এগিয়ে পারা যায়? গঙ্গার দিকে নেমে একবারে গোমুখের কাছে গেলাম। ওরাও এবার একই ভাবে আস্তে আস্তে আমার পাশে চলে এল। ডানদিকে বড় বড় দু'টো গহ্বর, তার বাঁপাশে দু'টো লম্বা লম্বা ফাটল। পুরো জায়গাটা কালো ধুসর রঙের। কিন্তু ওটা আসলে বরফ। বরফের রঙ কালচে সাদা কেন বুঝলাম না। ওপরেই সাদা বরফের চুড়া। আমরা দু'চোখ ভরে এই দৃশ্য দেখলাম। জানিনা এ জীবনে আর দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ পাব কিনা। নিজেদের এখন ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে। সরু গঙ্গা ফাটল থেকে বেরিয়ে, নিজের খেয়ালে বয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার মধ্যে অনেক বড় বড় পাথর পড়ে আছে। পাথরের ওপর উঠে অনেক ছবি তুললাম। কিন্তু এখানে গঙ্গার জল অসম্ভব রকমের ঘোলা। পাশে পাশে বরফ জমে আছে। তিনজন তিনটে ওয়াটার বটলে গঙ্গার জল ভরে নিলাম। এখানে কিভাবে বিপদ হতে পারে, বা সত্যনারায়ণ প্রসাদ ও তাঁর সঙ্গী কিভাবে বরফ চাপা পড়ে মারা গেলেন, তাও বোঝা গেল না। রহস্যই থেকে গেল। আসবার পথে গঙ্গার ধারে একটু আগেই একটা শ্মশান দেখেছি। সম্ভবত ওখনেই সত্যনারায়ণ পান্ডাকে শেষকৃত্য হয়েছে। তিনি সত্যিই ভাগ্যবান!

গোমুখ

মাধব ও দিলীপ এবার ফিরতে বলল। আমার কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। নন্দনকাননে তাঁবু খাটিয়ে তিনজনকে থাকতে দেখেছি। মনে হচ্ছে আমরা তিনজনও যদি ওরকম তাঁবু ফেলে দু'একটা দিন এখানে থাকতে পারতাম, কী ভাল হতো। প্রতিদিন যে নোংরা, অপরিচ্ছন্ন গঙ্গাকে আমরা দেখি, তার এত সুন্দর রূপ? আরও মিনিট পনের-কুড়ি ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে গঙ্গার রূপ ও পারিপার্শিক সৌন্দর্য উপভোগ করে, ভুজবাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। মনে হল স্বর্গ বলে সত্যি যদি কোথাও কিছু থেকে থাকে, তাহলে সেটা নিশ্চয় এখানেই। স্বর্গসুখ যদি পেতে হয়, সব দুঃখ জ্বালা ভুলে যদি শান্তি পেতে হয়, তাহলে এখানেই আসা উচিত। একটু এগিয়ে সাদা পতাকার ঢিবিতে উঠবার চেষ্টা করলাম। ঢিবিতে পা দিয়ে উঠবার চেষ্টা করলেই, ছোট বড় পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে পড়তে শুরু করে। শেষে এক পা তুলে, পাথরকে নীচে গড়াতে দিয়ে, না থেমে, চটপট ওপরে উঠে গেলাম। ঠিক যেন একটা গড়িয়ে যাওয়া ড্রামের ওপর দিয়ে হেঁটে, এখানে এলাম। তিনটে ওয়াটার বটলই আমার কাঁধে। দিলীপও একটু চেষ্টার পর উঠে এল। মাধব পাথর পড়ার দৃশ্য দেখে আর উঠতে পারে না। অনেক চেষ্টায়, ওই গড়ানো পাথরের মধ্যে দাঁড়িয়েই, লাঠি বাড়িয়ে ধরে ওকে টেনে তুলে আনা হল। কিছুক্ষণ পরে একইভাবে বিপদ মাথায় নিয়ে নীচে নেমে এলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, বাঁদিকে একটা উচু ঢিবির ওপর একটা প্রজাপতি ধরার জাল, হাওয়ায় উড়ছে। চিনতে পারলাম। গঙ্গোত্রী থেকে আসবার পথে এক জাপানিকে গোমুখ আসতে দেখেছিলাম, তার হাতে এরকম প্রজাপতি ধরার জাল ছিল। ওর ইংরেজি উচ্চারণ ছিল অদ্ভুত। একটা শব্দও বোঝা যায় না। অনেক সময় নিয়ে কথা বলে বুঝেছিলাম, সে জাপানে শিক্ষকতা করে। এখান থেকে স্যাম্পেল হিসাবে বেশ কিছু প্রজাপতি দেশে নিয়ে যাবে, এবং সেই জন্যই তার এখানে এত কষ্ট করে আসা। জানিনা জাপানে প্রজাপতির অভাব আছে কিনা। গোমুখ যে প্রজাপতির আড়ৎ, এ তথ্যই বা সে কোথায় পেল জানিনা! সত্যি, কতরকমের লোকই যে এই দুনিয়ায় আছে! আমরা কলকাতায় থাকি শুনে ও বলেছিল–"কালখাতা? এ ড্যানঝারাস্ সিতি"। ১৯৭২ সালে সে কলকাতা এসেছিল বলেই কি কলকাতাকে তার ডেঞ্জারাস সিটি বলে মনে হয়েছিল? যাহোক, জাপানি ভদ্রলোককে দেখলাম পাথরের ধারে শুয়ে থাকতে। একটা কুলি পিঠে টেন্ট বয়ে এনে এখানে খাটাচ্ছে। অর্থাৎ আজ রাতে সে এখানেই থাকবে। আমরা এবার ফেরার রাস্তা ধরলাম।

ভাগিরথী ও শিবলিঙ্গ শৃঙ্গ

পাথরের ওপর পাথর রাখা চিহ্নগুলো ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না। ওকে বললাম, যে যেদিক দিয়ে এসেছে, সে সেদিকে পাথর রেখে চিহ্ন রেখে গেছে। ফলে চারিদিকে অজস্র এই চিহ্ন দেখা যাওয়ায়, আরও অসুবিধার সৃষ্টি করছে। ওই চিহ্ন দেখে হাঁটতে গেলে গোলকধাঁধার মতো একবার ওপরে, একবার নীচে, একবার ডানদিকে, একবার বাঁদিকে ঘুরে মরতে হবে। চিহ্নের কোন প্রয়োজন নেই, গঙ্গাকে বাঁপাশে রেখে এগিয়ে গেলেই লালবাবার আশ্রম পাওয়া যাবে। নতুন হান্টার স্যু-র অনেক জায়গায় আঠা খুলে ফাঁক হয়ে গেছে। একটু এগিয়ে গঙ্গার ধারে একটা পাথরের ওপর বসে মনের সুখে খেজুর খেলাম। দিলীপকে জিজ্ঞাসা করলাম, এবার তার কেমন লাগছে? ডাবরানী থেকে এখানে আসতে না চেয়ে ফিরে যেতে চেয়েছিল বলে আর একবার মনভরে গালিগালাজ করলাম। ও অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে স্বীকার করল আমি জোর না করলে ওর এখানে আসা হতনা। এঁকেবেঁকে পাথর ডিঙিয়ে একসময় আমরা রাস্তায় এসে পড়লাম। অবশেষে লালবাবার আশ্রমে পৌঁছলাম। আশ্রমে অক্ষত অবস্থায় ফিরতে সমস্ত লোক ও গুরুভাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ভাবলাম যাত্রীদের জন্য এরা সত্যি কত চিন্তা করে। শুনলাম পুলিশ ও সকালের প্রায় অধিকাংশ জনই গঙ্গোত্রী ফিরে গেছে। চা খেয়ে চট পেতে বসে থাকলাম। আগুনের পাশে বসে থাকতে বেশ ভালই লাগছে। বসে বসে চিন্তা করছি ভালোয় ভালোয় যমুনোত্রী যেতে পারলে বাঁচি। সমস্যা হল এই মরণফাঁদ থেকে বেরনো। আর এই ফাঁদের বিস্তৃতি তো বিশাল। এখান থেকে সেই ভুখি পর্যন্ত। ওখানে না পৌঁছনো পর্যন্ত শান্তি নেই। কবে কিভাবে ফিরব জানিনা।

গুরুভাই আমাদের একটা বেশ বড় ঘরে নিয়ে গেলেন। আমরা আগুনের পাশ থেকে উঠে এসে সেই ঘরে বসলাম। কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল। মেঝেতে কিছুটা ফাঁক ফাঁক অন্তর সরু সরু কাঠের পাটাতন লাগানো। কারণ জিজ্ঞাসা করায় গুরুভাই জানালেন, ভিড়ের সময় যাতে কেউ বেশি জায়গা দখল করতে না পারে, তাই এ ব্যবস্থা। এক একটা ফাঁকে, এক একজনের শোবার ব্যবস্থা। ধনী, দরিদ্র, সবার জন্য একই ব্যবস্থা। এত সরু জায়গায় মোটাসোটা লোক হলে, কিভাবে শোবে ভেবে পেলাম না। ঘরে ঢুকবার ব্যবস্থাটাও ভারি অদ্ভুত। প্রথম ঘরের মধ্যে ঢুকে, ডানদিকের দেওয়ালে আর একটা দরজা দিয়ে দ্বিতীয় ঘরে যেতে হয়। আমরাও ওই ভাবেই দ্বিতীয় ঘরে এসে উপস্থিত হলাম। দ্বিতীয় ঘরটায় কোন জানালা বা তৃতীয় দরজা নেই। প্রথম ও দ্বিতীয় ঘরের মাঝের দরজা বন্ধ করে দিলে বাইরের এতটুকু ঠাণ্ডা হাওয়া দ্বিতীয় ঘরে ঢোকার অবকাশ নেই। দ্বিতীয় ঘরে ব্যাগ রেখে ছোট্ট মন্দিরের মতো ঠাকুরঘরের কাছে এলাম। আরতি শুরু হল। লালবাবার গুরুভাই আরতি করছেন। মন্দিরের ভিতরে কোন চেনা জানা দেবদেবীর ছবি বা মুর্তি স্থান পায় নি। ভিতরে দেখলাম একটা হনুমান, গঙ্গাদেবী ও লালবাবার গুরুদেব শ্রী বিষ্ণু দাসের ছবি। শুনলাম লালবাবার গুরুদেব শ্রী বিষ্ণু দাস বাঙালি। সম্প্রতি তিনি দেহ রেখেছেন। গোমুখ থেকে কিছুটা ওপরে তপোবনে উনি আশ্রম করে থাকতেন।

আগুনের সামনে বসে থাকাই আরামদায়ক। আশ্রমের কয়েকজন সেই একই প্রক্রিয়ায় রুটি তৈরি করছেন। বরঞ্চ এখানকার রুটি আরও স্বাস্থ্যবান। আমরা আর এক দফা চা খেলাম। মনে হয় এখানে অনেকটা চা একবার করে, আগুনের পাশে রেখে দেওয়া হয়। যার যখন প্রয়োজন বা ইচ্ছা, পাত্রে চা ঢেলে খেয়ে, পাত্র ধুয়ে রাখে। চা শেষ হয়ে গেলে, নতুন করে আবার তৈরি করা হয়। রাত্রের মেনু এই স্বাস্থ্যবান রুটি ও সকালের সেই ডাল। এখানে একবার

ডাল তৈরি হয় এবং সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কিছু তৈরি করা হয় না। ওটা শেষ হয়ে গেলে, আবার নতুন কিছু তৈরি করা হবে।
ঘরে এসে বসলাম কিছুক্ষণ। গুরুভাই একটা হ্যারিকেন দিয়ে যাবার সময় বলে গেলেন যে, তিনি আমাদের রাতের খাবার ঘরে দিয়ে যাচ্ছেন, আমাদের আর কষ্ট করে ঠাণ্ডায় বাইরে যাবার দরকার নেই। বললাম, আমাদের কোনও কষ্ট হবে না। বাইরে এসে আগুনের ধারে চট পেতে খেতে বসলাম। ভাবতেও অবাক লাগছে, কোথায় আমাদের বাড়ি, আর কোথায় কোন বরফের রাজ্যে, আগুনের ধারে চট পেতে বসে, ডাল রুটি খাচ্ছি। এই মুহূর্তে বাড়ির লোকেরা কী করছে কল্পনা করবার চেষ্টা করলাম। দু'টো মাত্র রুটি খেতে পারলাম। গুরুভাই বললেন, আমরা নিশ্চয়ই লজ্জা করে কম খাচ্ছি। বললাম, এই আতিথেয়তা কোনদিন ভুলব না। সত্যিসত্যিই আমাদের আর খিদে নেই। মনে মনে লালবাবা এখানে এখন নেই বলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। তিনি থাকলে দু'টো রুটি খেয়ে এত সহজে কিছুতেই নিস্কৃতি পেতাম না। আবার এরকম একটা মানুষকে একবার চোখের দেখা দেখতে পেলাম না বলে, কিরকম একটা কষ্টও অনুভব করলাম। খাওয়া হয়ে গেলে, বরফগলা ঠাণ্ডা নালার জলে, নিজেরাই থালা ধুয়ে দিলাম। জল এত ঠাণ্ডা যে মুখে দেবার উপায় নেই, তবু ওই ঠাণ্ডা জলই অনেক সময় নিয়ে বেশ কিছুটা করে পান করলাম। গুরুভাই এবার যে ঘরটায় আমরা ছিলাম, তার বাঁপাশে একটা দরজা দিয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন। দরজাগুলোর উচ্চতা খুব বেশি হলে চার ফুট। ওই দরজা দিয়ে ঢুকে, ডানদিকে ওই রকম আর একটা দরজা দিয়ে, আমরা আর একটা কাঠের ঘরে প্রবেশ করলাম। বাইরের সঙ্গে এ ঘরেরও কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। এই ঘরটাও বেশ গরম। গুরুভাই তাঁর ঘর থেকে, মেঝের ওই দু'টো পাটাতনের ফাঁকের মাপে তৈরি লম্বা, সরু তোষক ও একগাদা কম্বল বার করে দিলেন। প্রায় দু'ভাঁজ করে তোষক পেতে, তার ওপরে কম্বল পেতে, শোয়ার রাজকীয় আয়োজন করে নিলাম। এতক্ষণে গুরুভাইকে আসবার পথে দেখা তারার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি জানালেন যে, তিনি ওরকম কিছু কখনও দেখেন নি। হয়তো কোন জ্যোতি হবে, ভগবানের আশীর্বাদ হিসাবে এখানে নেমে এসেছে। ঠিক খবর পাওয়া গেল না। আমরা তিনজন পরপর শুয়ে পড়লাম। আরও দু'একজন এই ঘরে শুতে এল। এখানেও পিসুর উৎপাত যথেষ্টই আছে। এই ক'দিনে আমার সারা গায়ে কালো কালো, উঁচু উঁচু, দাগ হয়ে গেছে।

ভাগিরথী শৃঙ্গ - ১, ২, ও ৩ - সূর্যাস্তের সময়

ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে এসে দেখি, ভোর হয়ে গেছে। বেশ সুন্দর ভোরের আলোয়, দূরে গোমুখের সাদা পাহাড়, বেশ পরিষ্কার নীল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। আজ আগষ্ট মাসের একত্রিশ তারিখ। এবার আমাদের ফিরতে হবে। আমরা ফিরবার জন্য তৈরি হয়ে নিলাম। গুরুভাই চা খেয়ে যেতে বললেন। দেখলাম চা তৈরি হচ্ছে। এখানে থাকা-খাওয়ার জন্য কোন পয়সা লাগে না। ছোট মন্দিরটার কাছে একটা দানবাক্স আছে। ইচ্ছা হলে দান বাক্সে কিছু দেওয়া যেতে পারে। কত দেওয়া হল, আদৌ দেওয়া হল কী না, কেউ দেখতে বা জানতেও চাইবে না। না দিলেও কোন ক্ষতি নেই। একটা বোর্ডে দেখলাম, বড় বড় বিখ্যাত সব মানুষের নাম, যাঁরা এই আশ্রমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য, অনেক টাকা আশ্রমকে দান করেছেন। বেশিরভাগই বাঙালির নাম। বেশ ভাল লাগল, উমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কমল গুহ (শঙ্কু মহারাজ) ইত্যাদি অনেকের নাম লেখা আছে দেখে। এঁরা আড়াই হাজার টাকা করে দান করেছেন। আমরা সামান্য মানুষ, অতি সাধারণ লোক। তাই মাত্র পনের টাকা দানবাক্সে রেখে দিলাম।
সবজি বাগানের ওপাশে অনেক খরচ করে বিরাট পাকা বাড়ি তৈরি হচ্ছে দেখে ভেবেছিলাম, লালবাবার আশ্রমকে আরও বেশি যাত্রীর সুবিধার্থে বড় করা হচ্ছে। গুরুভাই জানালেন, উত্তর প্রদেশ সরকার ওখানে ষোল কামরার ট্রাভেলার্স লজ বানাচ্ছে। এখানে লালবাবার আশ্রম না থাকলে কতজনের গোমুখ দেখার সৌভাগ্য হত সন্দেহ আছে। আজ যেহেতু অনেক যাত্রী এখানে আসতে শুরু করেছে, তাই ব্যবসার খাতিরে বড় প্রাসাদ বানানো হচ্ছে। শুনলাম এই আশ্রম, সরকারের কাছ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য পায় না, বরং সরকারি জমিতে আশ্রম, চাষ ও জলের ব্যবহারের জন্য সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয়। তবে মিলিটারিদের কাছ থেকে এরা অনেকভাবে সাহায্য পায় বলে গুরুভাই জানালেন। অদ্ভুত, আমার তো মনে হয় না যে, যে একবার লালবাবার আশ্রমে থেকেছে, সে শুধু আরামে থাকার জন্য, পরের বার ওই সরকারি ট্রাভেলার্স লজে থাকবে। যাহোক, লালবাবার ডায়েরিতে নিজেদের নাম-ধাম লিখে, লালবাবার তিনটে ভিজিটিং কার্ড নিয়ে, গঙ্গোত্রীর উদ্দেশ্যে ফেরার পথে পা বাড়ালাম।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

আগের পর্ব - অতিকষ্টে লঙ্কা ও গঙ্গোত্রী

গোমুখ গঙ্গোত্রী হিমবাহ - পিছনে ভাগিরথী শৃঙ্গ

~ গোমুখের আরও ছবি ~

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার সুবীর কুমার রায়ের নেশা ভ্রমণ ও লেখালেখি। ১৯৭৯ সালে প্রথম ট্রেকিং – হেমকুন্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুনোত্রী। সেখান থেকে ফিরে, প্রথম কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসা। ভ্রমণ কাহিনি ছাড়া গল্প, রম্য রচনা, স্মৃতিকথা নানা ধরণের লিখতে ভালো লাগলেও এই প্রথম কোনও পত্রিকায় নিজের লেখা পাঠানো। 'আমাদের ছুটি' পত্রিকার নিয়মিত লেখক, পাঠক, সমালোচক এখন নেমে পড়েছেন কীবোর্ডে-মাউসে সহযোগিতাতেও।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বনবিবি বেত্তান্ত

তপন পাল

(১)

২০০৭ সালে লবণহ্রদের এক অফিসে আমার সহকর্মী ছিলেন ভাস্কর রায়। এক শীতের দুপুরে অফিস পালিয়ে, আমরা দুজনে লবণহ্রদের পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে (ই জেড সি সি) 'কারিগরের হাট' দেখতে যাই। তথায় বড় ঠাকুরের মূর্তি - অবয়বহীন মুন্ড যার মুকুট অতীব লম্বা - দক্ষিণ ২৪ পরগনায় যা বাস্তুঠাকুর মতান্তরে ধর্মঠাকুর রূপে আক্ষিণ দিন (পৌষ সংক্রান্তির পরদিন) পূজিত হন ও এছাড়াও নানা জায়গায় এই ঠাকুরের স্থায়ী 'থান' দেখা যায় - বিক্রি হচ্ছিল। লোকশিল্পের উদাহরণ হিসেবে আমি যখন ঘরে সাজিয়ে রাখার জন্য তা কিনতে উদ্যত, তখন শ্রীমান বলেন যে, এই মূর্তি ছাদের নীচে রাখতে নেই, রাখলে অমঙ্গল। তাঁদের বারুইপুরস্থিত ভিটায় এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রতি বছর আক্ষিণ দিনে বনবিবি তথা বিবিমার সঙ্গেই তিনি পূজা পান। তবে বিগ্রহের অবস্থিতি গৃহে নয়, পুকুরপাড়ের এক অস্থায়ী চালায়।
আমি তখন সদ্য অমিতাভ ঘোষের 'দ্য হাংরি টাইড' পড়ে উঠেছি। বনবিবি আখ্যান তথা জোহরনামায় আমার মস্তিস্ক পরিপূর্ণ। তৎক্ষণাৎ তাকে আমি বনবিবি, শাহ জংলি, দক্ষিণ রায়, অন্নপূর্ণা, দুখে-কে নিয়ে এক বক্তৃতা দিয়ে দিই। বস্তুতঃ মক্কায় জন্মগ্রহণ করা, জন্মসূত্রে মুসলিম ও দেবলোকের একমাত্র পায়ে জুতো পরা এই দেবীর প্রতি আমার আকর্ষণ বহুদিনের। হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মের লোকেরাই দেবীর পূজো করে, কিন্তু সে তো ঠেলায় পড়ে, নিরাপত্তার আশায় - আতিথ্য বিমুখ ডাঙায় জীবিকার তাগিদে ঘর থেকে বেরিয়ে বাঘ, সাপ, কুমীর, কামটের দাঁত থেকে বাঁচতে। দুই ধর্মাবলম্বীরা পুজো করলেও এবং ধর্মচিন্তার সমন্বয় প্রচেষ্টা সত্বেও দেবীর প্রতি দুই সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে কোথাও হয়তো সূক্ষ্ম তফাৎ আছে। মুসলিমদের কাছে দেবী আল্লাহের প্রেরিত; মতান্তরে মহম্মদের কন্যা ফতিমা, ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্না। তাঁদের পুজোও লাল পতাকা ও গাঁদাফুলের মালা নির্ভর। হিন্দুদের কাছে তিনি দেবী, মাতৃস্থানীয়া, তাঁর আরাধনা বাতাসা, মঠ, লাড্ডু নির্ভর। রায়দিঘী যাওয়ার পথে কাশীনগর বাজারের মধ্যে মাইবিবি মন্দির বহু প্রাচীন, অনেকখানি ছড়ানো। সেখানে বা নিকটবর্তী কৃষ্ণচন্দ্রপুরে গ্রামের শেষে মাঠের ধারে বনস্পতির আলোছায়ায় নির্জন ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির যাওয়ার পথে বনবিবির থানে পুজো দেখে সে রকমটাই মনে হয়েছিল আমার।
আমার জ্ঞান দেওয়া শেষ হলে শ্রীমান সবিনয়ে জানালেন যে তাঁদের গ্রামে অদ্যাবধি হই হই করে বনবিবি তথা বিবিমার পুজা হয় এবং আমি ইচ্ছা হলে গিয়ে দেখে আসতে পারি।
এমন আমন্ত্রণ ফেরানো কঠিন। বনবিবি সম্বন্ধে যেটুকু জানা, সবটাই পুঁথিগত। গ্রামের মধ্যে গিয়ে এমত লৌকিক দেবতার পুজো স্বচক্ষে দেখা, সঙ্গে বিনামূল্যে এক শীতের দুপুরের ভ্রমণ - ফলে না গিয়ে উপায় নেই।

(২)

তদনুযায়ী আক্ষিণ দিনে বেরিয়ে পড়া গেল। ভাস্করদের বাড়ি বারুইপুর শহরের প্রান্তে বারুইপুর আমতলা সড়কের উপরে ধোপগাছি গ্রামে, কল্যাণপুর গ্রামপঞ্চায়েত অফিসের বিপরীতে। ধোপগাছি ধবল গাজির অপভ্রংশ, যিনি ছিলেন 'সাহেবদের মত ফরসা' (এলবিনো?) এক সন্তপির। তাই তাঁর নাম ধবল গাজি, তাঁর নামেই গ্রামের নাম এবং লোকবিশ্বাসে তিনিই গ্রামটির স্রষ্টা তথা রক্ষাকর্তা। ওই সড়কের ওপরেই তাঁর মাজার। সড়কটি ব্রিটিশ আমলে নির্মিত। পির সাহেব তাঁর বহু পূর্বেই সম্ভবতঃ প্রয়াত, কারণ রাস্তার ভূমিবিন্যাস মাজারটি অক্ষত রেখে তীব্র বাঁক নিয়েছে। গোরা বাস্তুকাররাও সম্ভবতঃ পির সাহেবের শান্তি বিঘ্নিত করতে তথা তাঁর অপ্রিয় হতে চাননি। মাজারের পাশেই বাবা পঞ্চানন্দের মন্দির। ব্যাঘ্রারূঢ়, উগ্রচন্ড এবং দাক্ষিণ্যময় এই দেবতা আমাদের পরিচিত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং হাওড়ার অনেক জায়গাতেই তাঁর মন্দির আছে, বা থান। থানে একটি বৃক্ষ, মূলতঃ ন্যগ্রোধ তাঁর প্রতীক, দেবতা কল্পনায় বৃক্ষকাণ্ডে ধুতি জড়িয়ে রাখা হয়। ভাস্করদের বাড়ি গিয়ে দেখা গেল সে গেছে মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে। তারা এলে মধ্যাহ্নভোজ। ইতিমধ্যে একজন দ্বিচক্রযানের পিছনে বসিয়ে বিবিমার প্রতিমা নিয়ে এল। খাওয়া দাওয়ার পর কাঁসর-ঘন্টা, কাঁসি-শাঁখ বাজিয়ে, প্রতিমার গলায় গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে, পুকুরপারস্থিত বাস্তুদেবতাকে প্রণাম করে, প্রতিমাকে মাথায় নিয়ে যাত্রা শুরু হলো, পুজো বলতে এইটুকুনই।

বাসরাস্তা ছেড়ে পিচের রাস্তা, পিচের রাস্তা ছেড়ে মাটির রাস্তা, পথিপার্শ্বে পেয়ারাবাগান, বাঁধাকপির ক্ষেত, সময়ের পদচিহ্নহীন দীর্ঘ সুপারিবীথি। যেতে যেতে দেখা গেল আরও অনেকেই প্রতিমা নিয়ে যাচ্ছেন, বড় প্রতিমা হলে তিনি যাচ্ছেন তিন চাকার সাইকেল ভ্যানে চেপে। অনেক দূর থেকেই মাইকের আওয়াজ আসছিল - নিকটবর্তী হয়ে দেখা গেল দস্তুরমত মেলা বসে গেছে। কী নেই সেখানে - ঘুগনি, ফুচকা, লাল ডিমসেদ্ধ, রোল, সিঙাড়া, জিলিপি, কচুরি, গেরস্থালির বাসনকোসন - আরও অনেক কিছু। ক্রমে গিয়ে পড়া গেল রাধাবল্লভপুর বিবিমা স্পোর্টিং ক্লাব প্রাঙ্গণে। মস্ত বড় এক বাঁশঝাড়। তার গোড়ায় বেদি। দেখলেই বোঝা যায় সদ্য সদ্য মাটি কেটে তৈরি করা। সেখানে সার দিয়ে, নানা আকারের বিবিমাপ্রতিমা বসানো। কোথায় দেবী দণ্ডায়মানা, কোথাও ব্যাঘ্রারূঢ় দেবীর সঙ্গে সহোদর শাহ জঙ্গলি, দেবীর আদেশে যিনি শত্রু দমন করেন। কোথাও তিনি পাজামা ও নীল পাঞ্জাবি পরে বৃষারূঢ়, কোথাওবা লুঙ্গি পরিহিত। রয়েছেন মাতা শীতলা, দেবীর হাতে পর্যুদস্ত দক্ষিণরায় - জঙ্গলের অধিকর্তা তথা মোম মধুর সৃষ্টিকর্তা। মধু ও গোলপাতা আহরণকারী মৌলিদের কাছে বাঘরূপে তিনি বিপদের কারণ। তাঁর পায়ে হাঁটু অবধি ঢাকা বুটজুতো, কাঁধে বন্দুক, চেহারায় উগ্রচণ্ড। এতদিন জানা ছিল বনবিবিকে হিন্দুরা মূর্তিতে এবং মুসলমানরা হাজত করে পুজো দিয়ে থাকেন। এখানে এসে দেখা গেলো সে ভেদরেখা সুপ্ত। কে মূর্তি পুজো করছেন কে হাজত করছেন আর কে দণ্ডি খাটছেন, কে বাতাসা ছড়াচ্ছেন তা দেখে আর যাই হোক, হিন্দু মুসলমান বোঝা যায় না এবং সমগ্র অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করছেন জনৈক বেওয়া অর্থাৎ মুসলমান বিধবা। আমার মামাবাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজোয় ধুনো পোড়াবার চল আছে, অর্থাৎ মহিলারা উপবাসে থেকে স্নান সেরে, নতুন কাপড় পরে, দেবীমূর্তির সামনে বসে মাথায় একটি ও দুহাতে দুটি মাটির মালসায় নারকেলের ছোবড়া দিয়ে ধুনো পোড়াবেন। সাধারণতঃ কোন কামনাপূর্তির পরই এটা করা হয়। এখানে এসে দেখা গেলো সার দিয়ে মহিলারা ধুনো পোড়াচ্ছেন, এক দল উঠে গেলে আরেকদল। স্বেচ্ছাসেবকরা মাজননীদের মাথার মালসার আগুনে ধুনোর গুঁড়ো ছিটিয়ে দিচ্ছেন লম্বালম্বি; এক চকিত অগ্নিরেখা এক মুহূর্তের জন্য, কালো ধোঁয়ায় পদচিহ্ন রেখে। কোন কোন মহিলা ধুনো পুড়িয়েই, সম্ভবত সকাল থেকে না খেয়ে থাকার জন্যে, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। অত প্রতিমা অত মানুষ অত কোলাহল - সার্থক মেলা নামটি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আক্ষিণ দিনটিতে পৌষ পার্বণের পিঠা, পাটিসাপটা, তিলখাজা, টক দই ও দেশি মদ্য অবশ্য ভক্ষ্য। ছোটবেলায় দেখেছি আমাদের বাড়ির পরিচারিকা আরতিপিসি ওইদিন কাজে আসতেন না, সারাদিন বাড়িতে থেকে বৃদ্ধ বাবাকে পাহারা দিতেন। ছাড়া পেলেই তাঁর বাবা রেলষ্টেশনে চলে যাবেন। প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে দেশি মদের জোগানদার। কিন্তু এই মেলায়, এত দোকান এত লোকের মধ্যেও কোন মদের দোকান বা মাতাল ব্যক্তি চোখে পড়ল না।

বিবিমা মদ্যপান পছন্দ করেন না। জীবিকার দায়ে, পেটের জ্বালায় যারা সুন্দরবনের গহীনে যান, তাঁরা জানেন জীবন যেখানে কত নিষ্করুণ। প্রতি পদে কত সতর্ক থাকতে হয় এবং মুহূর্তের অন্যমনস্কতা কী বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই সমগ্র সুন্দরবনে মদ্যপান নিষিদ্ধ। বিবিমার থানেও তাই। মাতালরা গণপ্রহারের ভয়ে ওই দিন ওই দিক মাড়ায় না।

যারা ধুনো পোড়াচ্ছেন, দেখা গেল তাঁদের বেশিরভাগই সাদা শাড়ি পরা। তবে কি বিধবারাই ধুনো পোড়ান, প্রশ্ন স্বাভাবিক। কিন্তু উত্তরটি অস্বাভাবিক। শিবশংকর মিত্র ও অমিতাভ ঘোষ পড়ে আমরা জেনেছি যে পুরুষরা জঙ্গলে গেলে, গৃহে তাঁদের অনুপস্থিতিকালীন, তাঁদের স্ত্রীরা বৈধব্যবেশ ধারণ করেন। এখানেও তাই প্রথা। অনেক সধবাই ধুনো পোড়াতে এলে বৈধব্যবেশেই আসেন। ধুনো পোড়াবার আচারটি সম্ভবতঃ প্রতীকি, বৈধব্যবেশে স্বামীর প্রতীকি দাহকার্য করে ভাগ্যকে বিভ্রান্ত করার মরিয়া প্রচেষ্টা। এক প্রজন্ম আগেও তো মৃতবৎসা নারীরা ছেলের নাম রাখতেন কানা অথবা পচা, যম তাই শুনে তাদের 'খুঁতো' (দোষযুক্ত) ভেবে নেবেন না আশা করে।

না কি এটি অগ্নিপরীক্ষা? - বিশেষতঃ যেভাবে হাতে গরম অগ্নিগর্ভ মাটির মালসা ধরে রাখতে হয় । তাতে সে রকম মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। রামায়ণ থেকে ত্রিস্তান ইসল্টের মধ্যযুগীয় ফরাসি লোকগাথা, অগ্নিপরীক্ষা তো সতীত্বের চরম ও চূড়ান্ত পরীক্ষা সর্বকালে, সর্বদেশে। স্বামীর দীর্ঘকালীন বনগমন অনুপস্থিতিতে স্ত্রীটি যে নিষ্কলঙ্ক সাধ্বী ছিলেন, তাই প্রমাণ করতেই কি এতো আয়োজন ; কিন্তু জীবন যেখানে পদ্মপত্রে জলের চেয়েও চঞ্চল, ডাঙা যেখানে আতিথ্যবিমুখ, আকাশ যেখানে ঘূর্ণিক্ষুব্ধ, জল যেখানে সাপ কুমির কামটে ভরা, সেখানে বেঁচে থাকাটাই প্রতি মুহূর্তের পরম প্রাপ্তি। সেখানে এই সব ছোটখাটো ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামায়!

গ্রামের পথ ধরে, ক্ষেতের আল বেয়ে আরও অনেকখানি গেলে আন্ধারিয়া বলে একটি জায়গা। সেখানেও পুজোরই ব্যবস্থা, তবে অত হইহই নেই, কারণ মূল অনুষ্ঠানটি সন্ধ্যারাত্রে। বিশাল দুটি বনস্পতির গোড়ায় বিবিমা ও শাহ জঙ্গলির আলাদা আলাদা থান, চারিদিকে বড় বড় গাছ, নৈঃশব্দে ভরা।

এই পুজোর বৈশিষ্ট্য বনভোজন, বনভোজন পিকনিক অর্থে নয়, আক্ষরিক বনে গিয়ে ভোজন অর্থে। গ্রামীণ মহিলারা মাটিতে গর্ত করে, কাঠকুটো কুড়িয়ে এনে রাখছেন। সন্ধ্যারাত্রিতে উনুন জ্বলবে। এই অনুষ্ঠানও মানসিক নির্ভর-প্রার্থনা পূরণের পর ধন্যবাদজ্ঞাপন গোত্রের। খোলা আকাশের নীচে, মাটিতে গর্ত করে জ্বালানো উনুনে, সংগৃহীত কাঠকুটো জ্বেলে, মাটির হাঁড়িতে রান্না হবে। পদ একটিই, ভাত সব্জি সহযোগে সেদ্ধ, সঙ্গে অনেকখানি লবণ। উনুনের পাশে মায়ের নামে খোলা আকাশের নীচে বসে খেতে হবে এবং আহার্যের কোন অংশই বাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না- অব্যবহৃত কাঠকুটো বা হাঁড়িটিও নয় ; কারণ এসবই কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, বিবিমার। কাঁচালঙ্কা, জানা গেল এক দশক আগেও প্রবেশাধিকার পেতো না, তবে ইদানীং পেয়েছে, যদিও টমাটো অদ্যাবধি নিষিদ্ধ। খাওয়া শেষে, জায়গাটি এমনভাবে পরিস্কার করে দিতে হবে যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে এখানে মানুষে রেঁধে খেয়েছে। দেখে শুনে মনে হল আচারটি প্রতীকি। মৌলি অর্থাৎ যারা সুন্দরবনের গহিনে মধু বা গোলপাতা সংগ্রহ করতে যান তাদের নিরাপদে গৃহ প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী ধন্যবাদজ্ঞাপন।

(৩)

দন্ডবক্ষ ও রায়মণি নামে রাক্ষস দম্পতি সাঁইত্রিশ কোটি পিশাচ সিপাই লস্কর নিয়ে সুন্দরবন দখল করে। তাঁদেরই পুত্র দক্ষিণরায় রাজা হয়ে আরও অত্যাচারী হয়ে ওঠেন। বাঘের রূপ ধরে মানুষ খেতে থাকেন। সুন্দরবনের লোকবিশ্বাসে বাঘ মানুষ খায়না, দক্ষিণরায় বাঘের রূপ ধরে মানুষ খায়।

মক্কার ফকির ইব্রাহিমের প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তানা। সন্তানার্থে ইব্রাহিম গোলালবিবিকে বিবাহ করলেন। ওই সময় আল্লাহ স্থির করলেন বনবিবি ও শাহ জঙ্গলিকে তিনি মর্ত্যে পাঠাবেন। গোলালবিবি সন্তানসম্ভবা হলে প্রথমা স্ত্রীর প্ররোচনায় ইব্রাহিম তাঁকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে গেলেন। কারণ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে ; তার পিতৃত্ব- ক্ষমতা প্রমাণিত। আল্লাহ করুণাময়। তিনি গোলালবিবির জন্য চারজন দাইকে পাঠালেন, সেখানেই বনবিবি আর শাহ জঙ্গলির জন্ম, বেড়ে ওঠা। সাত বছর পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে ইব্রাহিম দ্বিতীয়া স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে যান। এর কিছুদিন পর, নমাজ পড়ার সময়, ভাই-বোনে দুটি টুপি পেলেন। খেলাচ্ছলে সেই টুপি মাথায় দিতেই মোজেজা (জাদু অর্থে) - তাঁরা ফিরে গেলেন জন্মস্থানে, আঠারো ভাটির দেশে। আঠারো ভাটির দেশে রাজা তখন পূর্বোক্ত দক্ষিণ রায়, বড়ই অত্যাচারী। শাহ জঙ্গলির আজানের আওয়াজ কানে যেতেই তিনি ক্ষেপে লাল। বন্ধু সনাতন রায়কে পাঠালেন খোঁজ খবর নিতে। সনাতনের মুখে সব শুনে দক্ষিণ যুদ্ধযাত্রা করবেন মনস্থ করলেন। এমন সময় দক্ষিণের মা নারায়ণী বললেন মহিলার সঙ্গে পুরুষের যুদ্ধ করা শোভা পায়না - এই বলে ভূত প্রেত দত্যি দানোদের নিয়ে তিনি যুদ্ধে এলেন। যুদ্ধ হল; এবং কিমাশ্চর্য দু-জনে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। দু'জনে সুন্দরবন আধাআধি ভাগ করে নিলেন।

বনবিবি বলে সই শুন দেল দিয়া ।
সকল আঠার ভাটি লহিব বাটিয়া ।।

বনবিবির ভাগে পড়লো মনুষ্যবসত আবাদের জমি। আর দক্ষিণ রায়ের ভাগে পড়লো গহন জঙ্গল । দক্ষিণ রায় এই ভাবেই হলেন গহন জঙ্গলের দেবতা। সেখানকার প্রাণী, ভূত, দত্যিদানোদের রাজা - মানুষের প্রবেশ নিষেধ । সেখানে ঢুকলেও তার কোন চিহ্ন রেখে আসা যাবে না। দেবতা ক্রুদ্ধ হবেন। নেমে আসবে বান তুফান কুমীর-কামট বাঘ-সাপের উৎপাত। মৌলি কাঠুরেরা জঙ্গলের ওই অংশে কোনো কিছু ফেলে আসা তো দূরের কথা, এমন কী মল-মূত্র ত্যাগ করেন না, থুতুও ফেলেন না - আজও; অদ্যাবধি। এর মধ্যে প্রকৃতিবাদের অরণ্য সংরক্ষণের বার্তা কি পাই না আমরা! উনবিংশ শতকের সাহেবরা আমাদের বলবেন, তবে আমরা বুঝব যে বন কেটে বসত কোন অবস্থাতেই অরণ্যকে সমৃদ্ধ করেনা, তাকে নিঃস্ব করে! খুলনার বাগেরহাট জেলায় নির্মীয়মান রামপল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প কি সেই শিক্ষাই দেয় না আমাদের, যে অরণ্যে নিরন্তর এক 'এথনিক ক্লিনসিং'-এর কাজ চলে – বন কেটে বসত করা মানুষের ভাগেও জমি থাকে না- ক্রমেই তা চলে যেতে থাকে শিল্পপতি, হোটেল মালিক, রিসর্ট মালিকদের হাতে।

ধনা আর মনা বারিজহাটি গ্রামে বসবাসকারী দুই ভাই। পেশায় মৌলে। মনার আপত্তি সত্ত্বেও ধনা সাতটা নৌকা, লোকলস্কর নিয়ে দক্ষিণ রায়ের মহলে গেলো, সঙ্গে দুখে। কেঁদোখালির চরে গিয়ে ধনা মধু আর পায় না। তিনদিন পর ধনার স্বপ্নে দেখা দিয়ে দক্ষিণ রায় বললেন তার মানুষ চাই। ধনা মনস্থির করলো দুখে-কে চরে ছেড়ে যাবে। মধু মিলল, মোমও। কাঠ সংগ্রহে দুখে যখন জঙ্গলে, ধনার নৌকা নোঙর তুলল। বাঘবেশী দক্ষিণ রায় দুখেকে খেতে উদ্যত। দুখের মা বলে দিয়েছিলেন বিপদে পড়লে বনবিবিকে ডাকতে, দুখে তাই করল,

আমায় কে ডাকলো.... মা বলে
শোন বলি ভাই শা জঙলি
যেতে হবে কেঁদোখালি
কোন বাছার আজ বিপদ ভারী
তাইতো আমার আসন টলে।।

ডাকা মাত্র বনবিবি আর তার ভাই শাহ জঙ্গলি এসে উপস্থিত। শাহ জঙ্গলি দক্ষিণ রায়কে প্রায় পরাজিত করে করে, এমন সময় বড়াখান গাজি (কুমিরের রক্ষাকর্তা ; তাঁর আবাস মহেশতলায়, নঙ্গী রেল ষ্টেশনের অনধিক দুই কিলোমিটার পূর্বে) দুজনের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করলেন। আর দুখেকে দিলেন সাত গরুর গাড়ি বোঝাই মণি -মাণিক্য, দক্ষিণ রায় তাকে দিলেন অনেক অনেক মধু আর মোম। তারপর বনবিবি তাঁর পোষা কুমির সেকোকে বললেন দুখেকে পৌঁছে দিয়ে আসতে গ্রামে। ফিরে গিয়ে দুখে ধনার মেয়ে চম্পাবতীকে বিয়ে করে চৌধুরী উপাধি গ্রহণ করলেন। এর মধ্যে সংহতি ও সামাজিক উত্তরণের ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় কি?

আঠারো ভাটির মাঝে আমি সবার মা ।
মা বলি ডাকিলে কারো বিপদ থাকে না।।

(৪)

শীতের ছোট বেলা, ইতিমধ্যে পড়ে এসেছে। সবাই রাধাবল্লভপুর বিবিমা ক্লাবে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেন, না বামনগাছির ঠাকুর আসবে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল বামনগাছি সন্নিহিত একটি গ্রাম এবং বামনগাজির অপভ্রংশ। বামন গাজি লোকবিশ্বাসে ধবলগাজির সহোদর খর্বকায় ভাই - তাই বামন। দুই ভাইয়ের নামে পাশাপাশি দুটি গ্রামের নামকরণ একটু অবাক করা বৈকি!

বিকাল ও সন্ধ্যার সন্ধিমুহূর্তে এক ছোট রাস্তায় দেখতে পেলাম অতি দীর্ঘ এক জনমিছিল। সামনে ঢাক, ঢোল, তারপর লাইন দিয়ে বামনগাছি গ্রামের ১২৩ জন বাসিন্দা এলেন, প্রত্যেকের মাথায় বিবিমা মূর্তি। মূর্তিগুলি ওই থানে স্থাপন করে সেদিনের মত দিন শেষ।
জানা গেল, অনুষ্ঠানটি শ'দেড়েক বছরের পুরনো। ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ পাথরপ্রতিমা ব্লকের গোবর্ধনপুরে খননকার্য চালিয়ে জানিয়েছিলেন যে, সুন্দরবনে মনুষ্য বসবাসের ইতিহাস খ্রীষ্টের সমসাময়িক। হুগলির নদীমুখ দীর্ঘকাল ধরেই বাণিজ্যিক জলপথ এবং সেই সূত্রেই মনুষ্যবাস। পর্তুগিজ ও আরাকানি জলদস্যুদের সৌজন্যে তার স্মৃতি অধুনাবিলুপ্ত। ১৯১৪ তেও [ওমালি (এল এস এস ওমালি) ১৮৭৪-১৯৪১ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার সূত্রে স্মরণীয়] সাহেব জানাচ্ছেন যে, এই অঞ্চল জলাভূমি, দ্বীপ, নদী-নালা, জঙ্গল পরিপূর্ণ। ব্রিটিশরাই বাঁধ দিয়ে নদীর নোনা জল আটকে, জঙ্গল কেটে কৃষিজমির পত্তনি দেন। হিন্দু- মুসলমানের সেই সম্মিলিত বসতি স্থাপনের দিনে, নির্দয়া প্রকৃতি ও নিষ্করুণ জীবনে নিরাপত্তার কামনায় দেবীর উদ্ভব। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, আজকের ক্রমবর্ধমান বারুইপুর শহরের এত কাছে মাত্র দেড়শো বছর আগে মানুষের প্রথম ও প্রধানতম আত্মরক্ষা ছিলো ব্যাঘ্রভয় থেকে মুক্তি।
সূর্য গেলো অস্তাচলে, আঁধার ঘনালো..... ভাস্করদের বাড়িতে বসে আগের দিনের পৌষ-পার্বণের ভক্ষ্যের সদ্গতি করার সময় শুনতে পাই মাইকে ভেসে আসছে যাত্রার সংলাপ।
ভাস্করদের বাড়ি থেকে যখন বেরোচ্ছি, তাঁর মাতাঠাকুরানী বললেন, যাচ্ছিস তো পিরতলায় হাজতটা দিয়ে আয়। ও মা হিন্দুতে হাজত দেয় নাকি? দেয়, সুন্দরবনে দেয় গো।
ঘন অন্ধকারের মধ্যে পির সাহেবের মাজার ও বাবা পঞ্চানন্দের মন্দির। মাথার ওপরে নক্ষত্রখচিত আকাশ। শহরের আলোকদূষণ এড়িয়ে আকাশ দেখা। তারপর বাড়ির পথ।
বস্তুতঃ এত ভালো লেগেছিল ওই দিনটি যে, তারপর বিবিমাপুজো দেখতে যাওয়াটা এক বার্ষিক অভ্যাসে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে শ্রীমতী পালও আমার সঙ্গী হন।
অনেক পরে, আমতলায় মহিষগোটের এক প্রত্যন্ত গ্রামে জনৈকার বাড়ি রক্ষাকালী পুজো দেখতে গিয়ে দেখেছিলাম তাঁদের ভিটায় পাশাপাশি বনবিবি, দক্ষিণরায় ও খয়েরবিবি, শঙ্কুসদৃশ ঢিবি আকারে প্রতিষ্ঠিত। ফলতা তেঁতুলতলায়, যেখানে অধুনালুপ্ত কালীঘাট ফলতা রেলপথের ফলতা ষ্টেশন ছিলো, অতিকায় তিন্তিড়িবৃক্ষের নীচে ঠিক ওই রকমটিই দেখেছি।

সূত্র -
১) অমিতাভ ঘোষ, দ্য হাঙ্গরি টাইড, পৃষ্ঠা-৮৪-৮৮, ২৯২-৯৭
২) বনবিবির জহুরানামা, মরহুম মুনশী মোহম্মদ খাতের সাহেব প্রণীত ৩) দক্ষিণ ২৪ পরগণার লৌকিক দেবদেবী,পালাগান ও সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা, দেবব্রত নস্কর
৪) বনবিবির পালা, সুজিত কুমার মৌলি সম্পাঃ
৫) ইসলামি বাংলা সাহিত্য, সুকুমার সেন
৬) সুন্দরবন সমগ্র, শিবশঙ্কর মৈত্র
৭) সোনালি দুঃখ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী তপন পাল বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য। ভালোবাসেন বেড়াতে আর ছবি তুলতে। 'আমাদের ছুটি'-র জন্যই তাঁর কলম ধরা।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

আরশিনগরে

সেথায় পড়শি বসত করে

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

লালন বলে জেতের কী রূপ দেখলেম না এই নজরে...

মায়ের কাছে আমন্ত্রণ এসেছিল বাংলায় বর্তমান বাউল-ফকির গোষ্ঠীকে সসম্মানে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যিনি প্রায় নিঃশব্দে লড়ে যাচ্ছেন, সেই অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা-এর কাছ থেকে, বাউল-ফকির সম্মেলনে যাওয়ার জন্য। ১৯৮২ সালে বীরভূমে জাব্বারের ন'জন শিষ্যকে হত্যার পাশাপাশি নদীয়া-মুর্শিদাবাদে বাউল-ফকিরদের গান করা ও ধর্মীয় বিধান না-মানার অপরাধে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার, একঘরে করা, চুল কেটে দেওয়া, ফতোয়া জারি করা হতে থাকে। অনেক বাউল-ফকির পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেন। এইসময়ে শক্তিনাথ ঝা মৌলবাদের বিরুদ্ধে বাউল-ফকিরদের সংগঠিত করতে প্রতিষ্ঠা করেন বাউল ফকির সঙ্ঘের - "মানুষ ভজি,মানুষ খুঁজি, মানুষকে করেছি সার।" এটা ১৯৮৩-৮৪ সালের কথা। তবে দুই বাংলাতেই বাউল-ফকিরদের ওপর অত্যাচারের ইতিহাস আরও দীর্ঘকালের। আর এখন নিয়ত চেষ্টা চলছে এই সঙ্ঘের ভেতরে ভাঙন ধরানোর, নানাভাবে। এই সব কিছুর ভেতর দিয়ে চলতে চলতেই বিস্তীর্ণ চর সীমান্তের উন্মুক্ত প্রান্তর পেরিয়ে পদ্মা নদীর ওপারের বাংলা থেকে বয়ে আসা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভারত-বাংলা সীমান্ত গ্রাম মনসাতলা জলঙ্গিতে বাউল ফকির সঙ্ঘের তেত্রিশতম সম্মেলন - ডিসেম্বরের ১৯ আর ২০ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মানুষেরই আগ্রহে, সহায়তায়।

১৯ তারিখ বিকেলে পৌঁছলাম সেই ঠিকানায় - মালিক ভরসা আশ্রমে। প্রতিষ্ঠাতা সদা হাস্যময় উদার মনের হামিদ ফকির নিজের আশ্রমকে 'সর্বধর্ম সমন্বয় সেবা আস্তানা' বলতে ভালবাসেন । সর্বজন এখানে সর্বদা স্বাগত। আশ্রমের একেবারে গা ঘেঁষে বাঁশ পুঁতে তাতে দড়ি বেঁধে বেশ কিছুটা জায়গা ঘেরা হয়েছে। মাথার ওপরে কাপড় ঢাকা। ছোট্ট মঞ্চ সাজানো কাপড়ের তৈরি রঙিন রঙিন দোতারায়। ঘেরা জায়গার ভেতরে খালি গা, মধ্যবয়সী শীর্ণকায় এক ফকির বড় করে কাঠের আগুন জ্বালিয়েছেন আর নিভে যাওয়ার উপক্রম হলেই তুষ, ধুনো ঢেলে দিচ্ছেন। পাশেই বেশ কয়েকজন ফকির কল্কেতে গাঁজা পুরে টান দিচ্ছেন। আইজুল ফকির নিজে নিরক্ষর, কোনোদিন মাদ্রাসায় পড়েননি বলে আক্ষেপ করেন, তবে তাঁর আশা ছেলেরা লেখাপড়া শিখে গীতা, কোরান পড়ে আইজুলের উপলব্ধিকে নিজেরাই যাচাই করে নিতে পারবে। অনুষ্ঠানের জায়গায় চট পাতা খড়ের বিছানা,পর্যাপ্ত লেপ কম্বল এবং তার পাশে ধিকি ধিকি আগুনের উত্তাপ - পরম আত্মীয়তা-ভালবাসার উষ্ণতা যেন।

শক্তিবাবুর এবং অন্য কয়েকজন বক্তার কিছু কথা বেশ লাগল। বাউল এবং ফকির এই দুই গোষ্ঠীকে আমরা সাধারণত আলাদা বলেই ধরে নিই। অর্থাৎ কী না বাউল হল হিন্দু এবং ফকির মানে মুসলমান। অথচ বাউল-ফকিরদের জীবন এবং যাপনের মূল কথা কিন্তু মানুষ এবং ভালোবাসা। যে সব কিছু ত্যাগ করেছে, সেই হল ফকির। লালন যেমন নিজেকে বিভিন্ন জায়গায় ফকির বলে উল্লেখ করেছেন। ফলে যারা কার্যক্ষেত্রে নিজেকে বাউল বা ফকির যে কোনো একটা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে কিছু সুবিধা পেতে চান, তারা আসলে কোনোটাই নন। জাতিভেদ, ধর্মভেদ এই সবের বিরুদ্ধেই এই বাউল-ফকির আন্দোলন। যা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে আরও-ই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

শক্তিবাবু বললেন, তাঁদের সামর্থ্য কম, রান্নার আয়োজন সামান্য। রান্না করেছেন ওখানকারই এক গ্রামের মানুষজন। মুসলিম এই গ্রামের মানুষেরা বংশানুক্রমে নিরামিষ খান। মাছ, মাংস, ডিমের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না। অথচ অনেক বৈষ্ণবও আছেন যাঁরা গান শুনতে এসে এঁদের হাতে রান্না বলে খান না।

আরেক জনের একটা কথাও বেশ লাগল। তিনি বললেন, বাউল বা ফকির আসলে একটা জীবনযাপন।

মৃদু নরম আলোয় চায়ের দোকানের খাটিয়ায় বসে চিনি ছাড়া লিকার চা আর বিস্কুট খেয়ে গান শুনতে বসলাম। স্যামুয়েল মণ্ডল, লাল মহম্মদ, লালচাঁদ ফকির এবং আরও অনেক নাম না জানা শিল্পীর কণ্ঠ ভাসে বাতাসে। কারোর গান মনকে স্পর্শ করে, কারোর বা শুধুই গলার জোর কানে অথবা প্রাণে ব্যথা দেয়। "বলে বলে মানুষ কে কি সাধু করা যায়?" - দীপঙ্কর ফকির শোনালেন জীবনের এক সার কথা। বাঁশি আর ঢোলের সংগতও যথাযথ। অনেকেই গান শুরুর আগে স্মৃতিচারণ করছিলেন, কেমন করে তাঁদের একঘরে করা হয়েছে, আরও নানাভাবে সামাজিক হেনস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ যে পায়ের তলায় শক্ত মাটি এনে দিয়েছে সেকথাও বললেন বারবার। যে গানটা সবচেয়ে প্রাণে গেল সেটা যিনি গাইলেন তিনি আপাত বাউল-ফকির নন, কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা, লেখালেখি করেন, গানটা তাঁর নিজেরই লেখা। নিজেকে খোঁজার কথা বললেন তাঁর গানে, নাম মনে পড়ে - মল্লিকা।

রাত বাড়ছে ক্রমশঃ, ঠাণ্ডাও। গান আর আলাপচারিতার ফাঁকে বাইরে বেরিয়ে সদ্য ভাজা গরম পেঁয়াজি আর ধোঁয়া ওঠা কফি - একটু উষ্ণতার খোঁজে।

ভিড়ের মাঝে ক্যামেরা হাতে ঘুরি - এ ভূমিকায় আমি নিতান্ত আনকোরা। এও মুশকিল, কেউ বা অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করে, কেউ বা বিরক্ত হয়ে বসে পড়তে বলে। আসলে ছবি তোলা অনেকটা ঈশ্বরসাধনার মতোই - পারিপার্শ্বিকই তোমার লক্ষ্য বস্তু, অথচ তাকে ধরতে গেলে তাকেই আগে উপেক্ষা করতে হয়। বাহ্য রূপটিকে অগ্রাহ্য করলে তবেই অন্তরের চেহারা ধরা পড়ে।

রাত বারোটা নাগাদ খেতে গেলাম। মাটিতে ভাঁজ করা চাদরে বসে থার্মোকলের থালা পেতে সারি দিয়ে একসঙ্গে খাওয়ার ব্যবস্থা। গরম ভাত, ডাল আর বেগুন, আলু, শিম ইত্যাদি দিয়ে একটা ঘ্যাঁট তরকারি - দিব্য লাগল - চেয়ে চেয়ে তরকারি খাই। মনে পড়ছিল ছোটবেলায় শোনা পূর্ণদাস বাউলের গানের কলি - "আমি মরছি ঘুরে সেই দুকানের সহজ ঠিকানা, যেথায় আল্লা হরি রাম কালী গণ এক থালাতে খায় খানা..."

ভোর চারটের দিকে গাইলেন আইজুল ফকির। বড় ভালো গান করেন আইজুল। তাঁর গানের সঙ্গেই আলো ফুটল, চারদিকে তখন ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াশা। ক্রমশঃ কুয়াশার চাদর সরিয়ে প্রকাশ্য হল সকাল। মাটির রাস্তার দু'দিকে বিস্তৃত সর্ষে ক্ষেত তখন দিকদিগন্ত আলো করে আছে। চার কিলোমিটার মতো মাঠ আর ক্ষেত পেরোলেই পদ্মা। ওপারে বাংলাদেশ। সেই ওপারে আমার দেশের বাড়ি ছিল - মাঝে মাঝেই 'কোমলগান্ধার' মনে পড়ে আজকাল। শুধু সে সুরের প্রেক্ষাপট বদলে বদলে যায়। ঘটনা একই থাকে। এক মানুষকে হত্যা করে আরেক মানুষ, নানা নামে - হিন্দু, মুসলমান, নাস্তিক...।

অথচ, ওদিকে লালন আপন মনেই গেয়ে যান - আসবার কালে কি জাত ছিলে/ এসে তুমি কি জাত নিলে/ কি জাত হবে যাবার কালে/ সে কথা ভেবে বলো না...।

মঞ্চের ওপরে নিচে নানা ভঙ্গিমায় মানুষ আর মানুষ - কমলা রঙের পাগড়ি আর জোব্বা পরা সাদা চুলের ফকির মানুষটির হাতে বিড়ি - গান শুনতে শুনতেই সুখটান, সাদা কাপড়ের প্রৌঢ়া ভাবের ঘোরে খানিক ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকেন দর্শকের ভিড়ের মাঝেই জায়গা করে নিয়ে, গাছের আড়ালে নিবিষ্ট মনে বসে গানের তাল ঠোকেন যে মাজা মাজা শ্যামল রঙের ফকির, যার চুলের এলোমেলো লম্বা জটা নেমেছে কোমর অবধি, ক্যামেরা হাতে আমাকে দেখে তাঁর চোখেও জিজ্ঞাসু চাহনি। পাশ দিয়ে চোখ চলে যায় নিপুণভাবে নিকোনো আশ্রমের মাটির দাওয়ায়। সামনে গাছগাছালি।

দু'পাশে হলুদ রঙের মাঠ, মাঝের কাঁচা পথ বেয়ে আজান আর সুজানের হাত ধরে হেঁটে আসছেন আমার সত্তোরোর্ধ মা।

আর আমি ক্যামেরার ফ্রেমে সেই চিরন্তন মানুষরতনের অন্বেষণ করে যাই - কখনও যদি ধরা দেয়।

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে, ঘরের পাশে আরশিনগর সেথা এক পড়শি বসত করে ...

আজান-এর সঙ্গে গল্প করছিলাম ছাদে। হঠাৎ দেখি ওর সঙ্গিনী সুজান ন্যাড়া ছাদের পাড় থেকে উঠে আসছে। হাতে এক গুচ্ছ সর্ষেফুল। বিলিয়ে

দিল আমাদের একটু একটু করে। কিন্তু কেমন করে ছাদ থেকে মাঠে গেল এবং ফিরে এল বুঝলাম না - পাইপ বেয়ে না গাছ! জিজ্ঞাসা করিনি। নীচে নেমে ফুলটা মাথায় গুঁজে নিলাম।

ইংরেজিতে 'হোম' শব্দটা যে নৈকট্যভাব বহন করে বাংলা 'ঘর' শব্দটা দিয়ে কি সেটা বোঝানো যায়? ভাবছিলাম। বাসা-র সঙ্গে আসলে ভালোবাসার একটা খাসা সম্বন্ধ আছে। গান শুনতে গিয়ে শীতের এক সকাল পর্যন্ত যে ঘরে অথবা বাসায় অথবা বাড়িতে ছিলাম সেখানে ইনাসুদ্দিন, মল্লিকা, ইন্দ্রনীল, সত্যম, সংঘমিত্রা, আজান, সুজান এমন চোদ্দ-পনেরো জন একসঙ্গে একরাত্তির-সকাল গান শোনায় আর গল্প-আড্ডা-আধঘুমে কেটে গেল। এদের মধ্যে কেউবা শিক্ষক, কেউ গবেষক, কেউবা আকাশবাণী মুর্শিদাবাদে কাজ করেন। সত্যম আর ইন্দ্রনীলের বাহন একটা বাইক, তার কেরিয়ারে দু'একটা জামা-কাপড়, প্রয়োজনীয় টুকিটাকি, শীতের সময় বাড়তি একটা কম্বল আর সবসময় পৌঁটলায় বাঁধা ছাতু। দুই বন্ধু অনেকটা সময়ই থাকেন পথে পথে, মেলায়-আখড়ায়। রাতে আমাদের সকলের জন্য বারবার করে উঠে দরজা খোলা-বন্ধ করছিলেন নুরুল হুদা, বাড়িটি যাঁর। সকালবেলায় থালায় থালায় মুড়ি এল, গরম চা আর বিস্কুট। ভিড় সরতে মায়ের সঙ্গে ভাব জমাতে বাড়ির বউটি হাজির হল। মাকে তার বোনের বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যাবে, এই ইচ্ছে। গাড়ি এসে গিয়েছিল, তাই রীতিমতো খিদে আর খাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও মাছের ঝোলভাতটা খাওয়া হলনা অনেক অনুরোধেও। ভাবছিলাম, ইস্, ঘন্টাখানেক আগে বলত যদি...। খুব সাধারণ মানুষের মধ্যে গেলে বোঝা যায়, মানুষ মানুষকে স্বভাবগতভাবে ভালোবাসে। সে ভালোবাসা স্বতঃস্ফূর্ত। না-ভালোবাসা অথবা বিভেদ সমাজের দ্বারা আরোপিত।

অধ্যাপক শ্রী শক্তিনাথ ঝা বাউল ফকির মেলার মঞ্চে

যাঁরা এই বাউল-ফকির গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছেন তাঁদের সবাই কতটা সেইভাবে এই ভালোবাসার অনুভব আত্মস্থ করেছেন বা তা নিয়ে ভাবেন তাতে সন্দেহ আছে। তবু তাঁদের হাত ধরেই বয়ে চলুক মানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টার এই গানের এবং প্রাণের পরম্পরা। ধর্মীয় বিভেদ আর সন্ত্রাসের দিনে কিছু মানুষ তবু ভালোবাসার কথা শোনাক।

"মিলন হবে কতদিনে, আমার মনের মানুষের সনে" - ফেরার পথে এগোই।

গান কতটা প্রাণে গেল জানিনা, তবে মানুষ দেখলাম। ওইজন্যই তো ভ্রমণ - নিজেকে জানা আর অন্যকে দেখা।

"আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা..."।

(তথ্যসহায়তা - দেব দাস)

'আমাদের ছুটি' -র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দময়ন্তী দাশগুপ্ত নেশায় লেখক, ভ্রামণিক, ভ্রমণসাহিত্য গবেষক। প্রকাশিত বই - 'অবলা বসুর ভ্রমণকথা' (সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত)।

মুন্সিয়ারির আত্মীয়তায়

সুমন্ত মিশ্র

~ মুন্সিয়ারির তথ্য ~ মুন্সিয়ারির আরও ছবি ~

জীপটা একটানা গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে বাঁকের পর বাঁক ঘুরে ওপরে উঠছে। ডান দিকে অনেক নিচে গৌরীগঙ্গার আঁকা-বাঁকা পথ, বাঁদিকে খাড়া পাথরের দেওয়াল, তার বুক চিরে কিছু গাছ সোজা ওপরে উঠে উঁকি দিচ্ছে আরও, আরও ওপরে কী আছে তা চাক্ষুষ করতে। জীপের গোঁ গোঁ আওয়াজের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার দূরের কোনো গ্রামে বেজে চলা মাদলের দিম্ দিম্ আওয়াজ। জীপের শব্দ যেখানে একটু কম, সেখানে মাদলের আওয়াজের সঙ্গে ভেসে আসছে মনমাতানো পাহাড়ি সুর - এমনই সুরেলা অভ্যর্থনায় কিছুটা বিস্ময়াবিষ্ট হয়েই আমার মুন্সিয়ারি পদার্পণ।

সচরাচর ট্রেক শেষ হওয়ার পর কোনও জায়গা-ই আমাকে সেভাবে আকর্ষণ করে না, তা সে যতই মনমুগ্ধকর হোক। নেহাৎ রাত্রিবাসের তাগিদে এক একটা জায়গা পার হয়ে ফিরে আসি বাড়িতে। পরে অবশ্য অনুতাপ হয় - যতটা অবজ্ঞা করেছি ওই জায়গাগুলোকে ততটা বোধহয় প্রাপ্য ছিলনা ওদের। সেবার গিয়েছিলাম 'দরমা ভ্যালি' বা 'পঞ্চচুলি বেসক্যাম্প' ট্রেক। ২০০৭-এ বাবাকে হারানোর পর হিমালয়ের গভীর অন্দরে আবার পথচলা। সেটা ২০০৯ - আমার প্রথম 'সোলো ট্রেক'। সম্ভবত দীর্ঘ তিন বছর বিচ্ছেদের পর হিমতীর্থ হিমালয়ও চেয়েছিল আমাকে একান্ত একা করেই, নইলে পাঁচ দিনের সারাটা পথ অমন পর্যটকশূন্য থাকবে কেন? সেও তো প্রথমবার। হিমপ্রকৃতির চড়াই উৎরাইয়ে দু'জনে কথা বলেছিলাম অনর্গল। পায়ে পায়ে পথচলা শেষ করেই ফিরে চলার পথে এক রাত্রিবাস ওই মুন্সিয়ারিতে।

জীপের মাথা থেকে স্যাক নামিয়ে শহরটা যেটুকু দেখা যায় একটু চোখ বোলালাম - বেশ বড় শহর, ভালো লাগল অনেক সবুজ এখনও অবশিষ্ট আছে দেখে। পিঠে স্যাক গলিয়ে হাঁটা দিলাম আরও কিছুটা ওপরে কুমায়ুন মন্ডলের গেস্ট হাউসের দিকে। পথ চলছি, কিন্তু চোখ সেই পঞ্চচুলির দিকে, পরিষ্কার নীল আকাশের নিচে শ্বেতশুভ্র পঞ্চশিখর, কানে ভেসে আসা পাহাড়ি সুর কথা খুঁজে পায় -"তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না"। সত্যিই, জীবনের সেই কোন সকালে দেওয়া তার ডাকে এই মধ্য চল্লিশেও ফিরে আসি বারবার।

কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম গেস্টহাউস - মুন্সিয়ারি

গেস্ট হাউসের রিসেপশন জানাল -'নো রুম'। আমি একা, এবং এতটা ট্রেক করে ফিরছি শুনে অবশ্য একটা উপায় বের হল - বেসমেন্টে ওঁদের দু'টি ডরমিটর' আছে, দু'টিতেই আটটি করে 'বেড'। আমাকে যে ডরমেটরিতে থাকতে দেওয়া হল, ওঁরা ঠিক করলেন সেদিন এরপর কোনো গেস্ট এলে পাশের ঘরটাতেই তাঁদের থাকতে দেবেন, একান্ত সেটাও ভর্তি হয়ে গেলে তবেই ওঁরা আমার বরাদ্দ ঘরটিতে অন্যদের জায়গা দেবেন। আব্দার এল - ট্রেকের সমস্ত ছবি ওঁদের দেখাতে হবে, আর কেমন করে সেখানে গেলাম তার বর্ণনা দিতে হবে। আন্তরিকতা মন ছুঁয়ে গেল, সানন্দে রাজি হলাম। নিজের রুমে গিয়ে দু'দিকের জানলার পর্দা সরালাম - সামনেই দিগন্ত জোড়া পঞ্চচুলি, মন ভরে গেল। টুকরো টুকরো সাদা মেঘ যেন চৈত্রের বুড়ির চুলের মতো ওর মুখের সামনে উড়ে বেড়াচ্ছে। গত সাত দিনে দূর থেকে, সামনে থেকে, এপার থেকে, ওপার থেকে দেখে দেখেও যেন আশ আর মেটেনা। সম্বিত ফেরে - "পিনে কা পানি সাব" আওয়াজে। ঘড়ি দেখি, বেলা দুটো, পেট চুঁইচুঁই, তাড়াতাড়ি 'ফ্রেশ' হয়ে বের হই।

বের হয়তো না হলেও চলতো, খাবার গেস্ট হাউসেও পাওয়া যেত। কিন্তু কাল রাত্রি থেকেই মনে সাধ জেগেছে চিংড়ি সহযোগে মধ্যাহ্নভোজ সারার - দিনটা ২৬ অক্টোবর আর সালটাতো আগেই বলেছি, মোহনবাগান সমর্থক মাত্রই বুঝতে পারবেন কেন সেদিন আমার মন চিংড়ির জন্য অমন ব্যাকুল ছিল। এর বেশি আর নাই বা বললাম। তবে সে সাধ আমার অপূর্ণই থেকে গিয়েছিল। মোটামুটি সমস্ত বড় হোটেলে খোঁজ করে ব্যর্থ হয়ে, বেলা তিনটেয় চাইনিজ খাবারে পরিতৃপ্তি।

খাওয়ার পরেই ইচ্ছে হল শহরটার একেবারে মাথায় চড়ে বসার। ধীর পায়ে উঠতে থাকলাম পাহাড়ি পথ ধরে। বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ উঠে এলাম সব ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে মুন্সিয়ারির মাথায়। বসলাম তার সুদৃশ্য সবুজ টুপিতে - পঞ্চচুলির মখোমুখি। সূর্য ডোবার পালায় তখনও বেশ কিছুটা দেরি।

পঞ্চচুল্লির গ্লেসিয়ার

একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম পঞ্চচুলি ও ওর সাঙ্গপাঙ্গদের দিকে, একেবারে বাঁদিকে সুন্দরী 'রন্ডা', মাঝে নাম না জানা কালো পাথরের এক শৃঙ্গ, তারপর পরপর পাণ্ডবদের পাঁচ চুলা - পঞ্চচুলি। প্রায় মিনিট কুড়ি একভাবে বসে থাকার পর লক্ষ্য করলাম আমার উঠে আসা পথেই আসছেন আরও কিছু আগন্তুক। কাছে আসতে বুঝলাম বিদেশি পর্যটক - একজন পুরুষ, দু'জন মহিলা। ভালো লাগল ওঁরা নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত নিচু গলায় কথা বলছেন দেখে। প্রকৃতি যেখানে ধ্যানমগ্ন সেখানে অহেতুক হাঁকডাক যে শিষ্টাচার পরিপন্থী এটা আমরা ভারতীয়রা কেমন করে জানি ভুলে যাই। অবশ্য যাঁরা আত্মবিস্মৃত জাতি, তাঁদের এমন বিস্মরণ স্বাভাবিক বৈকি। দেখতে দেখতে শুরু হল বরফের চূড়ায় চূড়ায় সূর্যাস্তের শেষ আলোর মায়াবী খেলা। ছবি তুললাম অনেকক্ষণ। গোধূলির রঙে ধরণীর স্বপ্নের রূপ প্রত্যক্ষ করে নেমে এলাম আজকের ডেরায় - কে.এম.ভি.এন. গেস্ট হাউস।

সন্ধ্যে সাতটায় ক্যান্টিনে ঢুকতেই হই হই করে সবাই ঘিরে ধরল। ক্যামেরা খুলে ছবি দেখালাম, সঙ্গে গল্পের স্রোত ভেসে যেতে লাগল পাহাড় থেকে পাহাড়ে। রাতের খাওয়া সেরে সাড়ে আটটাতেই বিছানার আশ্রয়। ঘুম আসার আগে বারবার মনে পড়ছিল ক্যান্টিনে ঘিরে থাকা মুখগুলো - ভাবছিলাম, আত্মীয় বলে জানি যাঁদের, এমন আন্তরিকতা কি তাঁদের কাছেও পেয়েছি কোনোদিনও!

মোবাইলের অ্যালার্ম বাজল - ভোর চারটে। মুখ ধুয়ে, টুপি, গ্লাভস, জ্যাকেট চাপিয়ে, মোটামুটি কল্পনার ইয়েতির মতো একটা সাজসজ্জা করে বেরিয়ে পড়লাম গতকাল বিকেলের গন্তব্যের দিকে। পাকদণ্ডির মুচমুচে বরফ ভেঙে উঠে এলাম চেনা জায়গাটিতে। প্রতীক্ষা সূর্যোদয়ের - পঞ্চচুলির দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা যেন - "এসো নির্মল উজ্জ্বল কান্ত / এসো সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত"। পাঁচটা বাজতে এখনও কিছুটা দেরি, পূবের আকাশ কিছুটা ফিকে হলেও আমার চারপাশে জমাট অন্ধকার, তারাদের আড্ডায় সব আকর্ষণ কি আজ বিচিত্র সাজের আমিই? সকলেই যেন চেয়ে রয়েছে আমারই মুখপানে! মুন্সিয়ারির ঘুম ভাঙতে হয়তো আরও কিছুটা দেরি - এমনটা ভাবতে ভাবতেই নীচ থেকে একটা আলোক বিন্দু এগিয়ে আসতে দেখলাম। তা থেমে গেল আমার থেকে কিছুটা দূরেই।

সকালের আলোয় মুন্সিয়ারি

সময় দ্রুত পেরোচ্ছে, যেকোনও মূহূর্তে সূর্যের প্রথম কিরণ রাঙা হয়ে ঝাঁপ দেবে পঞ্চচুলির শিখর থেকে শিখরে। - ক্যামেরায় চোখ রাখি, ছবি নিই, তবে মন ভরেনা। পাহাড়ের মাথা টপকে সূর্যদেব পূর্ণ প্রকাশিত হতেই ফিরে যাওয়ার পালা, কয়েক ধাপ নামতেই চোখে পড়ল গতকালের সেই বিদেশি পর্যটক - ভোরের অন্ধকারে চলমান আলোকবিন্দু। আজ কোনো সঙ্গী ছাড়াই। বেচারি বেশ সমস্যায় পড়েছেন মনে হল, এক হাতে ক্যামেরা নিয়ে একটা উঁচু ঢিবি থেকে নামতে বেশ দ্বিধাগ্রস্ত। কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম। পথ চলতে আলাপ জমে উঠল। ভদ্রলোকের নাম 'জন', আমাদের দেশে নিউজিল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত। তাঁর এক বন্ধু থাইল্যান্ড থেকে সস্ত্রীক বেড়াতে এসেছেন। বন্ধুদের নিয়ে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী কুমায়ুন ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কথা বলতে বলতে হঠাৎ আগ্রহী হয়ে আমার তোলা ছবি দেখতে চাইলেন। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে স্ক্রিনে সব দেখালাম। গতকালের সূর্যাস্তের ছবি দেখে একেবারে আত্মহারা। বিশ্বাসই করতে চাননা কোনো আলাদা 'ফিল্টার' ব্যাবহার না করেই এমন ছবি উঠেছে। শেষমেশ ওঁর ক্যামেরাতেই পঞ্চচুলির সঙ্গে একটি ছবি তুলে দিয়ে তবে নিস্তার মিলল। আবার পথচলা। আমার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতেই আবার গল্প জমল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা কাল সারাদিন এখানে একটা ড্রামের আওয়াজ পেয়েছ?" হ্যাঁ বলতেই বললেন, "আমি ওই আওয়াজটা অনুসরণ করে কাল নিচের একটা গ্রামে গিয়েছিলাম", জানতে চাই, গিয়ে কি দেখলেন? বলেন, "আরে আমি তো তাজ্জব বনে গেছি, দেখি পুজোর নাম করে ওঁরা জীবহত্যা করছে।" তারপরই আমায় প্রশ্ন করেন, -"আচ্ছা তোমাদের ধর্ম কি জীবহত্যার কথা বলে?" কি বলব! আমার দেশের ধর্মই যে বলে, 'আত্মবৎ সর্বভূতেষূ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি' - সকল প্রাণীকে আত্মবৎ যে দেখে, সেই যথার্থ দেখে। কারণ সে জগতের সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে পরম সত্য কে দেখে। আমি আমার মত করে সাহেবকে বোঝাই - সমস্ত দেশে, সমস্ত কালে মানুষ তার তাৎক্ষণিক সুখের কারণে ধর্মের উপদেশ অগ্রাহ্য করেছে, আমার দেশের সাধারণ মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। পার্থক্য একটাই, এমন সুখের দিনেও তাঁরা অন্যদের মতো পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হন না। এমন দিনেও ওঁরা ইষ্টদেবের পূজার্চনা করেন। সাহেব কী বুঝল জানিনা, তবে সম্মতির অভিব্যক্তি লক্ষ্য করলাম।

জন আজ যাবেন 'চৌকরি'। আমি যাব 'লোহাঘাট', সেখান থেকে মায়াবতী আশ্রম ঘুরে টনকপুর, লখনউ হয়ে বাড়ি। জনের কাছ থেকে বিদায় নিলাম গেস্ট হাউসের গেটে। বিদায় নিলাম আন্তরিক উষ্ণতায় ভরিয়ে দেওয়া গেস্ট হাউসের প্রতিটি মানুষের কাছে। পথে যেতে যেতে মনে পড়ছিল আমার দেশের মাটি থেকে উঠে আসা ক'টি কথা, - অসতো মা সদগময়/তমসো মা জ্যোতির্গময়/মৃত্যোর্মামৃতং গময়, - অসত্য হতে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার হতে আমাকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমায় অমৃতে নিয়ে যাও, - জানিনা আমার দেশের মানুষজন এই প্রার্থনাটি সমস্ত জীবন দিয়ে কবে খুঁজে পাবেন।

আমিও কি খুঁজে পাব কোনোদিন?

সূর্যাস্তের আগুনে পঞ্চচুল্লি

~ মুন্সিয়ারির তথ্য ~ মুন্সিয়ারির আরও ছবি ~

অ্যাকাউন্টেন্সির ছাত্র সুমন্ত কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস্ থেকে কম্পিউটার সার্টিফিকেট কোর্সের শেষে কিছুদিন দিল্লিতে একটা চাটার্ড ফার্মে কাজ করে বর্তমান ঠিকানা দুর্গাপুরে ফিরে আসেন। এখন সেলফ্ এমপ্লয়েড, - 'হরফ' নামে একটি প্রিপ্রেস ইউনিট চালান। হিমালয়ের আতিথ্য গ্রহণ ও ফুটবল খেলার দৃষ্টিসুখ তাঁকে অসীম তৃপ্তি দেয়। ভালোবাসেন রবি ঠাকুরের গান শুনতে, প্রবন্ধ পড়তে, ছোটগাছকে বড় করতে, বেড়াতে আর নানারকমের মানুষের সাহচর্য পেতে। ইন্টারনেটের দুনিয়ায় 'আমাদের ছুটি' কিছু সমমনস্ক মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়ায় আনন্দিত হয়েছেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select - ▼
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ক্রৌঞ্চদ্বীপ কুমারাকোমে

মণিদীপা বন্দোপাধ্যায়

~ কুমারাকোমের তথ্য ~ কুমারাকোমের আরও ছবি ~

কর্মসূত্রে কোচি আসাযাওয়া লেগেই থাকে। এবারে একটা সাপ্তাহান্তিক ছুটি ম্যানেজ করে ছুট লাগালাম কুমারাকোমে। কুমারাকোম পাখিরালয় কোট্টায়াম জেলায় ভেম্বানাড হ্রদের ধারে ছায়া সুনিবিড় শান্তির এক পক্ষীনীড়। সর্ববিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন ইন্টারনেট মহোদয়ের হিসেব অনুযায়ী কোচিন থেকে দূরত্ব ৬২-৯০ কিমির ভেতরে। সময় লাগা উচিত সোয়া ঘন্টা থেকে বড়জোর পৌনে দুই। নানা মুনির নানা মত অনুযায়ী বিভিন্ন ওয়েবসাইটের হিসেব বিভিন্ন রকম, তাই এই মতভেদ। সে যাইহোক ছ'ঘন্টা পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। শুরুতে মারাত্মক ট্রাফিক জ্যাম, তার পর কখনো ঝিরঝিরিয়ে কখনোবা মুষলধারায় নামা বৃষ্টির যুগপৎ আক্রমণে সময়ের দফারফা। তা অঘটন-ঘটন-পটিয়সী 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া'-র এও একটা বড় আকর্ষণ বৈকি। তাই কখন পৌঁছব তার ভাবনা শিকেয় তুলে বৃষ্টি স্নাত প্রকৃতির স্নিগ্ধ কোমল রূপ নেহারনে মন দিলাম।
যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। কোথাও শস্যভরা হালকা সবুজ ক্ষেত্র, কোথাও তাল, সুপুরি, নারকেলের ঘন সবুজ বনানী। কোথাও রবার গাছের দলবদ্ধ জোট, তাদের গায়ে নীল রংয়ের থলি বাঁধা, যাতে টিপ টিপ করে সংগৃহীত হয় তাদের শরীরনিঃসৃত ঘন তাজা রস, যা পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয় জমাট রবার ও হাজারো জিনিসে। এর ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারে দুধসাদা বাড়ি, তার লাল টালির চাল। আঙিনায় কলাগাছের ঝোপ, আবার তার পাশেই ঝাঁ-চকচকে দামি গাড়ি। ট্রাডিশন আর আধুনিকতার চমৎকার মেলবন্ধন। বৃষ্টির ক্রমাগত অভিঘাতে, কেরালায় বৃষ্টির আধিক্য বরাবরই বেশি, সর্বত্রই এক জড়সড়, নরমসরম ভাব। দুঃখ একটাই, চা আর গরমাগরম পকোড়াটাই পাওয়া গেল না। বৃষ্টি উপেক্ষা করে কোকথামঙ্গলামে (KOKATHAMANGALAM) চা পান বিরতি নেওয়া হল। কিন্তু প্রচণ্ড মিষ্টি কফি, আর ধোসা, ইডলি, সম্বর বড়া ছাড়া কিছুই জুটল না। তাতে বঙ্গললনার স্বাদ বা সাধ কোনটাই মিটল না।
সন্ধ্যে ছুঁই ছুঁই, পৌঁছলাম কুমারাকোম। কেরালার অন্নক্ষেত্র (Rice Bowl) কুট্টানাড় অঞ্চলের একটি ছোট্ট জনপদ। সমুদ্রতল থেকে নীচে এই অঞ্চলটি আসলে কয়েকটি খুবই ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি। কোনো সমুদ্র নয়, ভেম্বানাড হ্রদই এখানে সমুদ্রসম। লোকমুখে শোনা, ১৮৪৭ সাল নাগাদ অ্যালফ্রেড জর্জ বেকার তৎকালীন কেরালার রাজার থেকে অনুমতি নিয়ে ভেম্বানাড হ্রদের পার্শ্ববর্তী জায়গাতে চাষবাসের জন্য কিছু জমি তৈরি করতে শুরু করেন। তবে জলাজমিরই প্রাধান্য এখানে। খাল, খাঁড়ি, বিল, লেক, নদী সযতনে ঘিরে রয়েছে এই জনপদটিকে। তাই যে দুটি মালয়ালি শব্দ মিলে কুমারাকোম, 'কুমিনজা' আর 'আকম', তার অর্থ নদীর পলি জমে জমে তৈরি হওয়া স্থান। অবশ্য এর মতভেদও আছে। মতান্তরে 'কুমার' দেব যাঁর অন্য নাম ভগবান মুরুগন-এর আলয় বা 'অহম' আছে বলেই এর নাম কুমারাকোম। প্রমাণস্বরূপ কুমারাকোমের কেন্দ্রে রয়েছে একটি সুদৃশ্য 'মুরুগন' মন্দির। এখানে বলে রাখি, 'মুরুগন' দেব হলেন আমাদের দুগ্‌গা ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র – কার্তিকেয় বা কার্তিক। ইনি দক্ষিণ ভারতে বিশেষভাবে পূজিত হন।

তা সে যে মতেই বিশ্বাস করা হোক না কেন, আধুনিক কুমারাকোমের রূপকার এবং স্থপতি হিসাবে বেকার সাহেবের নাম সর্বজনবিদিত এবং স্বীকৃত। সেই বেকার সাহেবের বাংলোতে, বর্তমানে যেটি তাজ গ্রুপের হোটেল, সেখানেই আমাদের রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত। গাছগাছালিতে ভরা মূল বাংলোটি এখনও অক্ষতই আছে। সেটি এখন ডাইনিং হল ও রিসেপশন এলাকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মাঝখানে একটি ছোট্ট জলাধার বা লেক। তার একপাশ দিয়ে সার সার কুটির, যার অন্দরের অঙ্গসজ্জায় আধুনিকতার সবরকম উপাদান মজুত থাকলেও বহিরঙ্গে পড়েনি কোনো ছাপ। রাঙা ইঁটের পথ ধরে খানিক এগোলে সবুজের ফাঁক দিয়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে হঠাৎই সামনে এসে দাঁড়ায় ভেম্বানাড - দিগন্তবিস্তৃত অতল জলরাশি ধূসর সন্ধের রহস্যময়তা গায়ে মেখে।

তাজ কুমারাকোম রিসর্টের নান্দনিক সাজ

বৃষ্টি থেমে গেছে বেশ খানিকক্ষণ। দুকাপ কফি নিয়ে বারান্দায় বসে মৃদু আলাপচারিতা চলছে। ঝিঁঝিঁদের একটানা ঐকতানে কানে তালা লাগার যোগাড়। হঠাৎই প্রথমে একটা দুটো করে তারপর একসঙ্গে ডাইনিং হল সংলগ্ন মাঠে হাজার বাতির রোশনাই। খানিক থতমত খেয়ে শুভাশীষ ছুটল ক্যামেরা আনতে। আর আমি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে মন ক্যামেরায় গেঁথে নিলাম সেই অনবদ্য দৃশ্যটি। লেকের মাঝখানে একটা ছোট্ট দ্বীপ - তাতে হাত পা মেলা এক বিশালাকায় বটবৃক্ষ আগেই লক্ষ্য করেছিলাম। বড় বড় পাথরের চাঁইও পড়ে থাকতে দেখছিলাম। সেই দ্বীপে গাছ-পাথরের গা বেয়ে হঠাৎ ধেয়ে এল চলমান জলরাশি - আলোর ঢেউয়ে নাচতে নাচতে, আওয়াজে কাঁপন তুলে দিল এতক্ষণের শান্ত লেকের বুকে।

পাখিদের জলসা কুমারাকোমে

ভোর হতে না হতেই প্রথম সূর্যের আলোর আভাসে পক্ষীকূলের সোল্লাস অভ্যর্থনায় কান পাতা দায়। তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়লাম প্রাতঃভ্রমণে। তাজ হোটেলের পাশেই কুমারাকোম পাখিরালয় যেটি ভেম্বানাড বার্ড স্যাংচুয়ারি নামেও পরিচিত। চৌদ্দ একর জায়গা নিয়ে বেকার সাহেবের নিজ হাতে সৃষ্ট এই পাখিরালয়টি গড়ে উঠেছে কাভানুর নদীর তীরে। অবশ্য সাহেব এটিকে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট হিসেবেই শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে স্থানীয় ও পরদেশি পক্ষীকূল নিজেরাই এই স্থানটিকে পছন্দ করে নিয়েছিল। ধীরে ধীরে সংখ্যা বাড়তে বাড়তে একসময় গড়ে ওঠে কুমারাকোম পাখিরালয় - কেরালার প্রথম সংরক্ষিত পক্ষিনিবাস। ১৮০ টি প্রজাতির প্রায় ২৫০০০ পাখির আবাসস্থল যার মধ্যে পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যাও কম নয়। বিভিন্ন ধরনের হেরন ছাড়াও, টীল, পার্পল মুরহেন, ইগরেট, মার্শ হ্যারিয়ার, পানকৌড়ি, মাছরাঙা, চিল, টিয়া, বিভিন্ন রকমের হাঁস এখানে সবসময় দেখতে পাওয়া যায়। ঋতুভেদে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বাড়ে কমে।

প্রাতঃরাশ সেরে চললাম পক্ষীদর্শনে। 'তাজ ভিভান্ত' ছেড়ে দু'পা এগোলেই স্যাংচুয়ারির গেট। গেট পেরোতেই পার্কিং লট। তার পাশে অফিসঘর। টিকিট কেটে প্রদর্শনী কক্ষে ঢুকলাম। বিভিন্ন সময়ে দৃশ্য পাখিদের ভারি সুন্দর, রঙিন সব ফটো দেওয়াল জুড়ে। পাশের প্রোজেকশন হলে নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী কুমারাকোম স্যাংচুয়ারি নিয়ে তথ্যচিত্র দেখানো হয়। প্রায় বছর পনেরো আগে যখন প্রথমবার কুমারাকোমে আসি তখন এসব কিছুই ছিল না। পায়ে চলা সরু রাস্তা দিয়ে, জল কাদা ভেঙে, কাঁটায় হাত পা কেটে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম বেনু গাইডের হাত ধরে। ছোট ছোট খালগুলির ওপরে কাঠের গুড়ির সাঁকো, জোরে হাঁটলে প্রবল দুলতে থাকত। মনে আছে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল ছেলেমেয়েরা। সেই তুলনায় এখনকার ব্যবস্থাপত্র অতি চমৎকার। এখন স্যাংচুয়ারির ভিতরে কেরালা ট্যুরিজমের হোটেল তৈরি হয়েছে - ওয়াটারস্কেপ। সেখানে ওয়াচ টাওয়ারে বসে দিনণভর পাখিদের নড়াচড়া, কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়। সেক্ষেত্রে চাই অশেষ ধৈর্য ও অসীম মনোযোগ। পক্ষীপ্রেমী মাত্রই আমার এই কথাটি এক বাক্যে মেনে নেবেন। অফিস ঘর পেছনে ফেলে পিচরাস্তা ধরে খানিকটা এগোতেই চেকপোস্ট। পিচরাস্তা পৌঁছেছে পর্যটক আবাসে। তার জন্য বুকিং থাকা আবশ্যক। ডানদিকের সরু ইঁট বাঁধানো রাস্তা ধরে ঢুকে পড়লাম জঙ্গলের অন্দরমহলে। জঙ্গলই বটে। বিরাট বিরাট ম্যানগ্রোভজাতীয় বৃক্ষ তাদের বড় বড় পাতার ছাতা মেলে রুদ্ধ করে রেখেছে সূর্যালোকের সহজ আনাগোনা। চমৎকার আলো-আঁধারি পরিবেশ। নীচে মাটির বুকে ঘাস আর বুনো ঝোপের ঠাস বুনোট। পাখি সব কলরব তো করছেই কিন্তু দর্শন পাওয়া যায় না সহজে। যা হোক, চেষ্টার খামতি থাকে কেন? পথ গিয়েছে জঙ্গলের এক ধার দিয়ে। যে পথে যাওয়া, ফেরাও সেই পথে। সব মিলিয়ে ছ'সাত কিমি রাস্তা হবে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কাভানুর নদী, নদী না বলে খালই বলা ভাল। মাছরাঙা ও পানকৌড়ির দাপাদাপিতে মনে হচ্ছে মাছ ভালই আছে। মাছরাঙার মাছ ধরার দৃশ্যটি বড় নজরকাড়া, অনেকক্ষণ ধরে শিকারটিকে তার পছন্দমতো উচ্চস্থান থেকে তাক করে, তারপর সুপারসনিক গতিতে ডাইভ মেরে জল থেকে শিকারটি ছোঁ মেরে নিয়ে সটান উর্দ্ধপানে। অথচ জলের বুকে হালকা কাঁপন ছাড়া বিশেষ কিছুই অনুভূত হয় না। তুলনায় পানকৌড়ির মৎস্যশিকার খানিকটা মন্থর গতির। তারা আবার অনেক সময় সাবমেরিনের মতো ডুব সাঁতার দিয়েও শিকার ধরে। এর স্থানীয় নামটি ভারী মজার 'কাক্কাতাড়ুয়া'।

বেশ খানিকক্ষণ অন্ধকারে থাকলে চোখ যেমন সয়ে যায়, জঙ্গলেও তাই। প্রথমে কিছুই দেখা বা বোঝা যায় না তারপর আস্তে আস্তে সজাগ হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয়গুলো - চোখে তখন হাজার পাওয়ারের জ্যোতি। হাওয়ার মৃদু শনশনানিও কানে বাজে। শরীরের রোমকূপগুলো প্রখর অনুভূতি প্রবল হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ সেটা যদি হয় কোনো অভয়ারণ্য। অতটা না হলেও অতিন্দ্রিয় ক্ষমতায় বলীয়ান আমি রীতিমতো চিরুনিতল্লাশি চালাতে লাগলাম। পাতার সরসরানিতে তাকিয়ে দেখি ৪-৫ জনের এক হেরন পরিবার বন ভ্রমণে বেড়িয়েছেন - সঙ্গে একটি নেহাতই দুগ্ধপোষ্য শিশু। কুমারাকোমে চার রকমের হেরন প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই স্যাংচুয়ারিতে পুরো কেরালা রাজ্যের মধ্যে সব থেকে বেশি সংখ্যক হেরন পাওয়া যায়। গ্রে হেরন, পন্ড হেরন, নাইট হেরন, ইস্টার্ন গ্রে হেরন। রিফ হেরনের খবর এখানে বিশেষ পাওয়া যায় নি। এদের স্থানীয় নামগুলি বেশ ধ্বনিমধুর। চরামুন্টি (গ্রে), কুলামুন্টি (পন্ড), পেরুমুন্টি (ইস্টার্ন গ্রে) ইত্যাদি।

আকাশে রঙের খেলা - লেকের জলে তার ছোঁয়া

স্যাংচুয়ারির শেষ প্রান্তে যেখানে কাভানুর এসে মিশেছে ভেম্বানাড লেকে, সেখানে বেশ কিছু ওয়াটার বার্ড দেখলাম, বিভিন্ন ধরনের ইগ্রেট - ক্যাটল ইগ্রেটেরই সংখ্যাধিক্য ছাড়াও রয়েছে টিল আর স্টর্কজাতীয় পাখি। পরিযায়ী পাখিদের সময় নয় এটি - তারা আসে মোটামুটি নভেম্বর-

ডিসেম্বর নাগাদ, কখনও বা জানুয়ারিও হয়ে যায়। মার্চ-এপ্রিল থেকে আবার ফিরতে শুরু করে। স্যাংচুয়ারি দর্শনের সেরা সময় তাই ডিসেম্বর থেকে মার্চ-এপ্রিল।

দুপুরে ডিঙি নৌকো বেয়ে খাঁড়ি পথে পাড়ি দিলাম। স্যাংচুয়ারি থেকে খানিকটা এগোতেই বোট ক্লাব। ঘন্টায় তিনশো টাকা দর হেঁকে মাঝি বাবাজীবন কী ভেবে দুশোতেই রাজি হয়ে গেলেন। আমি পড়ে গেলাম সমস্যায় - গড়িয়াহাট, হাতিবাগানে বাজার-করা মানসিকতায় আর একটু দরাদরি করলে ঠিক হতো কিনা ভাবতে ভাবতেই নৌকায় উঠতে গিয়ে প্রায় উল্টে পড়ার যোগাড়। শেষে সেই মাঝির সাহায্যেই কোনক্রমে থিতু হলাম। এই ধরনের নৌকাবিহার করতে চাইলে, দুটি আপ্তবাক্য মেনে চলবেন - প্রথমতঃ একটু দরদাম করে নেবেন তবে সিজনে সম্ভবপর কিনা বলতে পারবো না, দ্বিতীয়তঃ এবং বেশি জরুরি - নৌকাতে উঠবার বা নামবার সময়, এবং নৌকা চলাকালীন বেশি নড়াচড়া করবেন না। তাহলেই নিজে বা তরণী ডুবে যাওয়ার ঘোরতর সম্ভাবনা। শুভাশীষ ছবি তোলার অত্যুৎসাহে বার কয়েক নৌকা টালমাটাল হলেও মাঝি দক্ষ হাতেই তা সামাল দিয়েছিলেন।

নৌকা চড়ে হাঁস ছড়ানো ব্যাকওয়াটারের জলে

আমাদের ছোটোনদীর মতো ছোট খাঁড়িটিও এঁকেবেঁকে চলেছে। কাশবনের বদলে কখনও একধারে কখনও দুধারেই লোকালয়। বাংলো প্যাটার্নের সুন্দর সুন্দর বাড়ি - সাদা দেওয়াল আর লাল টালির চাল, একঘেয়ে সবুজের মধ্যে ভারী দৃষ্টিনন্দন। প্রত্যেক বাড়ি থেকে বাঁধানো ঘাট এসে মিশেছে জলে। কোথাও কোন গ্রামের বউ বসে গৃহকর্ম সারছে, কোথাও ভাই বোনে মিলে বড় এক ছাঁকনি দিয়ে কুচো মাছ ধরায় ব্যস্ত। কোথাও এক পাল হাঁস রীতিমতো শোরগোল তুলে জলে দাপাচ্ছে। একজনকে দেখলাম একটি ডিঙি নৌকো নিয়ে প্রায় শতখানেক হাঁসের এক দলকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভারি মজার সে দৃশ্য। একদিক থেকে জড়ো করে তো তারা অন্যদিকে পালায়। জলে তার বিশাল লগির আওয়াজ ওঠে ছপাৎ ছপাৎ, ঠিক যেন গ্রামীণ বঙ্গজীবনের জলছবি। শুধু বাড়ির দোরগোড়ায় গরুর গাড়ির বদলে অত্যাধুনিক চারচাকা। তা যে জেলা থেকে সব থেকে বেশি সংখ্যক NRI উৎপাদিত হয় - বাড়ি পিছু একটি-দুটি - সেখানকার গ্রামও যে প্রাচুর্যে ভরপুর হবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

বিকেলে রিসর্টের লঞ্চে করে ভেম্বানাডে জলবিহার। বেশির ভাগই বিদেশি, দু'চারজন উত্তর ভারতীয়, আর বেশ কয়েকজন বাঙালি। পরে রিসর্ট আয়োজিত 'চা পান' অনুষ্ঠানে বাঙালি ম্যানেজার শ্রী জয়ন্ত দাস জানালেন যে বাঙালি পর্যটকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। ভারি অমায়িক ভদ্রলোক, কর্মসূত্রে প্রায় বছর দশেক বাংলার বাইরে। তাজ গ্রুপের বিভিন্ন পর্যটক আবাস ও রিসর্টে সম্মানের সঙ্গে কাজ করেছেন। এর আগে ছিলেন কোচিনে। জানালেন রিসর্টের তরফ থেকে প্রতি সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে নৃত্যগীত পরিবেশিত হয়। বৃষ্টি না হলে তা অনুষ্ঠিত হয় খোলা জায়গায়, অন্যথায় ডাইনিং হলের ভিতরে। আর রোজ সন্ধ্যে সাতটায় সাড়ে সাতশ মাটির প্রদীপ জ্বালান হয় মাঝখানের লেক ও তার সংলগ্ন স্থান জুড়ে। এটি এদের 'কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্পের অন্তর্গত। স্থানীয় কমিউনিটির লোকেরা এই কার্যটি করে থাকেন। কাল দেখেছিলাম, আজ জানলাম। ভারি অভিনব লাগল এই ভাবনাটি। মাটির প্রদীপ তো আজকাল দেখাই যায় না বিশেষ - সর্বত্রই টি ক্যান্ডেল (Tea Candle) এর চল। সেখানে মৃৎশিল্পীদের সাহায্যকল্পে গৃহীত এই প্রজেক্ট নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

জেটিতে বসে ভেম্বানাডের শান্ত সৌন্দর্য উপভোগ করছি। মাঝে মাঝে মোটরবোটের বিক্ষিপ্ত আওয়াজ, তাদের যাবার সময় জলের বুকে কিছু ঢেউয়ের উথালপাথাল, এছাড়া বিশেষ কোনও শব্দ নেই। বহু দূরে সবুজ তটরেখা, তার পিছনে আকাশ জোড়া নীল ক্যানভাস। ধীরে ধীরে তাতে ফুটে ওঠে লাল তুলির আঁচড়। একটা, দুটো, চারটে, ছটা বাড়তে বাড়তে একসময় সমস্ত ক্যানভাসটাই তারপর লাল হয়ে যায়। সেই লালের ছোঁয়া এসে লাগে ভেম্বানাডের বুকে। লজ্জারাঙা কনেবউটির মতো ঘোমটা টানে সে, তার ঘোমটার আড়ালে টুপ করে লুকিয়ে পড়ে রক্তচক্ষু দামাল সূর্যটা। ঘরে ফিরতে শুরু করে পাখির ঝাঁক। পাড়ের কাছে যে শাপলার দঙ্গল এতক্ষণ নিথর পড়েছিল হঠাৎই তা সরগরম হয়ে ওঠে পাখিদের বিশ্রম্ভালাপে। কত পাখিই না বাসা বেঁধেছে সেখানে। কিছুক্ষণ বসে বসে তাদের নানান ধরনের আলোচনা শুনলাম সরু, মোটা, বিভিন্ন ধরনের গলায়, শেষে মশার কামড়ে রণে ভঙ্গ দিলাম। একটা মশক নিবারণী ক্রিম অবশ্যই সঙ্গে রাখবেন।

ঠিক সাতটায় কালকের মতোই আলো জ্বলে উঠল। কিছু কিছু জিনিস যেমন কিছুতে পুরোনো হয় না, আলোকসজ্জাও তাই। বিশেষতঃ তা যদি পরিবেশের সঙ্গে সুন্দর করে মানিয়ে যায়। আমাদের কুমারাকোম সফরের এই আলোকসজ্জাটি উপরি পাওনা। কর্নাটকি সঙ্গীত ও নৃত্যসহযোগে নৈশাহারটিও খুবই উপভোগ্য ছিল। পরদিন ঝলমলে সকালে কুমারাকোমের ঝলমলে স্মৃতি নিয়ে 'ফুল রিচার্জড' হয়ে কর্মক্ষেত্রে যোগ দিলাম।

ভেম্বানাড লেকে বৈকালিক নৌকাবিহার

~ কুমারাকোমের তথ্য ~ কুমারাকোমের আরও ছবি ~

কুড়ি বছরেরও বেশি সাংবাদিক জীবনে দেশবিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে শিল্প-সংস্কৃতি-ভ্রমণ সম্পর্কিত লেখা পরিবেশন করছেন মণিদীপা। ভ্রমণপিপাসু এই লেখিকা ঘুরেছেনও সারা ভারতে তথা বিশ্বের নানান দেশে। স্টেট্‌সম্যান, জেটউইং, ভ্রমণ ও মনোরমা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে সাবলীল হয়েছে তাঁর লেখনী। তাইপেই-তে বসবাসকালীন চায়না পোষ্ট কাগজে সাপ্তাহিক কলাম লিখতেন। এছাড়াও ওয়াশিংটন পোষ্ট, ডিসকভার তাইপেই, ট্রাভেল ইন তাইওয়ান ইত্যাদি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা প্রবন্ধ।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

সাতকোশিয়ার অরণ্যে

পল্লব চক্রবর্তী

- তাহলে আমরা যাচ্ছি কোথায়?
- খুব দূরে নয়, কাছাকাছি বলতে পারিস... এখান থেকে কটক, সেখান থেকে আঙ্গুল আর তার থেকে একটু দূরে সাতকোশিয়া টাইগার রিজার্ভ-এর টিকরপাড়া নেচার ক্যাম্প।
- কি আছে সেখানে?
- ওহ! তুই বুঝি বুদ্ধদেব গুহ'র 'ঋজুদার সাথে পুরুনাকোটে' পড়িসনি ? তাহলে জানতিস ওখানে আছে পাহাড়, বন, জঙ্গল - এক কালে অনেক বাঘ ছিল, এখনও বোধহয় দুটো-চারটে আছে, আর এ সবের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে দারুণ সুন্দর এক নদী।

সময়টা নভেম্বরের শেষ দিক। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। দ্রুত নেমে আসা সন্ধ্যায় তিন বন্ধু – আমি, রাজীব আর অর্জুন অফিসের পর আড্ডা দিচ্ছিলাম আর তিন চার দিনের ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায় তাই নিয়ে আলোচনায় মেতে ছিলাম। হঠাৎ করে মাথায় এল সাতকোশিয়ার কথা। কিন্তু সাতকোশিয়া যাওয়ার হ্যাপা বিস্তর। প্রথমে যেতে হবে আঙ্গুল, সেখানে আবার একটাই সাপ্তাহিক ট্রেন যায় হাওড়া থেকে। না হলে কটক কিংবা ভুবনেশ্বর নেমে চেঞ্জ করে যেতে হবে।

তবে কিনা কথাতেই আছে উঠল বাই তো কটক যাই...আমরাও রাতের ট্রেন ধরে ভোররাতে নামলাম কটক। সেখান থেকে আর এক ট্রেন ধরে আঙ্গুল। কটক থেকে আঙ্গুল যাওয়ার রেলপথটি ভারি সুন্দর। দুপাশে অনুচ্চ পাহাড় শ্রেণী আর জঙ্গল, তারই মাঝে মাঝে অলস ভাবে শুয়ে থাকা নির্জন প্ল্যাটফর্ম। আঙ্গুল-এ নেমে বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর পৌঁছনো গেল সাতকোশিয়া ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিসন এর ইকো ট্যুরিজম সেলের অফিসে। টিকরপাড়া নেচার ক্যাম্প-এর বুকিং সারতে গিয়ে বুকিং খাতায় উঁকি মেরে দেখি এবছর আমরাই প্রথম ট্যুরিস্ট। এখানেই দেখা হল বোলেরো গাড়ির ড্রাইভার কাম গাইড সুনীল সাহুর সঙ্গে। ঠিক হল আগামী কয়েকদিন সুনীলই হবে আমাদের সাথী, সেই আমাদের সব ভালো করে ঘুরিয়ে দেখাবে।

আঙ্গুল শহর পেরনোর একটু পরই শুরু হল পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা প্রায় জনমানবহীন পথ ধরে আমাদের এগিয়ে চলা। দুপাশের চমৎকার দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে পেরিয়ে গেলাম প্রায় ষাট কিলোমিটার রাস্তা। মাঝে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের চেকপোস্টে একটু বিরতি, কাগজপত্র সব দেখিয়ে আর প্রবেশ মূল্য দিয়ে আবার গাড়িতে বসলাম। আর বেশ কিছুটা যাওয়ার পর গাড়ি যখন থামল, মনে হল বিরাট এক পোস্টারের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি - আশেপাশে পাহাড়, মাঝখানে খোলা জায়গায় সারি সারি তাঁবুতে ট্যুরিস্টদের থাকার জায়গা আর ঠিক সামনে দুপাশে পাহাড়কে সাক্ষী রেখে বয়ে চলেছে শান্ত, নিস্তরঙ্গ মহানদী। জল তার নীলচে সবুজ। আমাদের তিন জনের মুখ থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে এল – "অসাধারণ"। মনে হল এত বেড়াতে গেছি কিন্তু এরকম জায়গায় আগে কখনও আসিনি।

গোটা দশ-বারো টেন্ট থাকার জন্য। টেন্টের ভিতরে বেশ অনেকখানি জায়গা, সব মিলিয়ে ব্যবস্থা মোটের ওপর ভালোই। তবে সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল এই দারুণ সুন্দর জায়গায় আমরাই একমাত্র ট্যুরিস্ট। দুচোখ ভরে চারপাশটা দেখতে লাগলাম। ক্যাম্পের ম্যানেজারবাবুকে দুপুরের খাওয়ার কথা বলতে,তিনি একটু নির্লিপ্ত মুখে জানালেন - এখন তো আর কিছু খাবার পাওয়া যাবে না, আপনারা যে আসবেন আমরা খবর পাইনি। কি সর্বনেশে কথা! সকাল থেকে পেটে চা, বিস্কুট ছাড়া আর কোনও দানাপানি পড়েনি। শেষে এই জনমানবহীন জায়গায় উপবাসে কাটাতে হবে নাকি ? খিদেটা যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমাদের করুণ মুখ দেখে বোধহয় তাঁর একটু মায়া হল, বললেন তাহলে একটু অপেক্ষা করুন ডাল ভাত আলুভাজা আর ডিমের অমলেট করে দিচ্ছি। আমরা সমস্বরে বললাম - বেশ তাই হোক, খিদের মুখে এতো অমৃত। একটু দূরে একটা নারকোল পাতায় ছাওয়া গোল ঘরে খাওয়ার আয়োজন। বেশ তৃপ্তি করে খেয়ে যখন উঠলাম তখন বিকেল হয়ে এসেছে।

এরপর নদীর সামনে চেয়ার পেতে বসে থাকা। নীল নদী, সবুজ পাহাড় আর নীল আকাশের দিকে চেয়ে কখন যে সময় কেটে যায়...। মনে হয় এ নদীর দিকে তাকিয়ে অনন্ত সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। এভাবে কখন পড়ে আসে বেলা... মহানদীর নীলচে সবুজ জল ক্রমশ গাঢ় নীল হতে থাকে। প্রায় নির্জন, নিস্তব্ধ সেই সন্ধ্যায় আমরা মহানদীর বুকে এদিক ওদিক খানিকটা হেঁটে আসি। এরপর সব পাখির ঘরে ফেরার সময় হয়, এ নদীও ফুরিয়ে ফেলে জীবনের সব লেনদেন, অতঃপর থাকে শুধু অন্ধকার...।

সন্ধ্যা হতেই জাঁকিয়ে বসলো ঠাণ্ডা আর নির্জনতা। চা আর পকোড়ার সাথে জমে উঠল আমাদের তিন বন্ধুর আড্ডা। মাথার ওপর বাঁকা চাঁদ আর ঝিঁঝিঁর একটানা ডাকে কেমন যেন গা ছমছমে পরিবেশ। নিজেদের মনে হলো বহির্জগত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন - এখানে খবরের কাগজ নেই, টিভি নেই ,এমনকি মোবাইল নেটওয়ার্কও নেই। এরই মাঝে আসে খাওয়ার ডাক। মহানদী থেকে ধরা টাটকা কালবোশ মাছের ঝোল দিয়ে চমৎকার খাওয়া সেরে একটু সকাল সকালই শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোর ভোর উঠে পড়তে হল। ম্যানেজার বাবু আগে থেকে নৌকা ঠিক করে রেখেছিলেন। সকাল সকাল বার হলে নাকি মহানদীর চড়াতে শীতের সকালে রোদ পোহানো কুমীরের দেখা মেলে। আমরা ভেসে পড়লাম নীল নদীর বুকে, ভোরের হিমেল হাওয়া আর মিঠে রোদ্দুর গায়ে মেখে। সত্যিই 'শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি'। চোখ আমাদের রোদে চিক চিক করে ওঠা বালুচরের দিকে, এই বুঝি কুমীর দেখা যায়। কত নাম জানা - না-জানা পাখি দেখে ফেললাম, দেখলাম কচ্ছপও - কিন্তু এ যাত্রায় আর কুমীরের দেখা মিলল না। তাতে অবশ্য আমাদের বিন্দুমাত্র আক্ষেপ ছিল না। ঘণ্টা দুয়েকের নৌ-সফরের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করার মতো। চোখ জুড়িয়ে দেয় মাথার উপর ঘন নীল আকাশ আর দুই পাড়ের সবুজ পাহাড়।

ফিরে এসে নদীর ধারে খড়ে ছাওয়া ঘরে বসে চারপাশ দেখতে দেখতে লুচি আর ঘুগনি দিয়ে অসাধারণ ব্রেকফাস্ট সেরে গেলাম সুনীলের গাড়িতে করে জঙ্গলে ঘুরতে। ফেরার পথে সুনীল একজায়গায় গাড়ি থামিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার পথ হাঁটিয়ে আমাদের নিয়ে গেল নাম না জানা ছোট এক পাহাড়ি নদীর কাছে। শান্ত, নিস্তব্ধ এই বনের মধ্যে উপল রাশির উপর দিয়ে সশব্দে বয়ে চলা নদী বোধহয় এক সময় হারিয়ে গিয়েছে মহানদীর বুকে। টলটলে স্বচ্ছ জল দেখে নেমে পড়লাম নদীতে। জঙ্গলের মধ্যে যে এত চমৎকার ভাবে স্নান সেরে নিতে পারব তা ভাবতে পারিনি।

নেচারক্যাম্পে ফিরে মহানদী থেকে ধরা টাটকা মাছের ঝোল ভাত খেয়ে একটু বিশ্রাম। রোদ পড়লে ক্যাম্পেরই এক কর্মচারী আমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন। পড়ন্ত বিকেলে মহানদীর তীর ধরে বেশ ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চিতা সহ কী কী বন্য জন্তু দেখেছেন, তার গল্প করতে করতে আমাদের নিয়ে গেলেন পুরনো নেচার ক্যাম্পের জায়গায়। পুরনো নেচার ক্যাম্পটি ছিল একেবারে মহানদীর বুকে চড়ায়। তবে সেটি সাতকোশিয়া টাইগার রিজার্ভের কোর এরিয়ার মধ্যে পড়ায় বর্তমানে নদীর পাড়ে উঠে এসেছে। সব মিলিয়ে অসাধারণ পরিবেশ। কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল কাল ফিরে যেতে হবে ভেবে। আবার সেই গতানুগতিক জীবন...। নদীর বুকে দুই পাহাড়ের মাঝে চিরকাল মনে রাখার মতো সূর্যাস্ত দেখে প্রায় অন্ধকারে গা ছমছম করা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলাম, তখন মাথার ওপর বাঁকা চাঁদ উঠেছে।

পদার্থবিজ্ঞানের স্নাতক পল্লব চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্য কর দফতরের আধিকারিক। ভালোবাসেন নানা ধরণের বই পড়তে। নেশা ব্যাগ ঘাড়ে করে পরিবারের কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে কাছে বা দূরের ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়া। বেশি পছন্দের পাহাড় আর বন। এক সময় দার্জিলিং-এ চাকরি করেছেন বেশ কিছু দিন। সেই থেকে পাহাড়ের সঙ্গে মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়া।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

এভারেস্ট বেস ক্যাম্প - পথের ডায়েরি

শুভজিত চৌধুরী

~ তথ্য- এভারেস্ট বেসক্যাম্প ট্রেক ~ || ~ এভারেস্ট বেসক্যাম্প ট্রেকিং-এর আরও ছবি ~ || ~ এভারেস্ট বেসক্যাম্প ট্রেকরুট ম্যাপ ~

এভারেস্ট - নামটার মধ্যেই যে কি এক চৌম্বক শক্তি লুকিয়ে আছে কে জানে! পৃথিবীর পর্বতপিপাসু সব মানুষের কাছেই হিমালয়ের এ মুকুট যেন নয়নের মণি। এহেন পর্বতশৃঙ্গের পাদমূল স্পর্শ করতে পারা যে কী আনন্দের তা বলে বোঝানোর নয়। অথচ স্বপ্ন যে সত্যি এভাবে সফল হবে তা ভাবতে পারিনি। স্বপ্ন দেখছি অবশ্য সেই ২০০৯ থেকে। ট্রেক করতে যাওয়ার উপযুক্ত সময়, আনান্ খুঁটিনাটি, অফিসের ছুটি ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজ খবর সেরে ঠিক করলাম ২০১৪-এর শেষে যাব। সঙ্গী হবে আমার মামাতো ভাই শান্তনু।
নেপালের প্রচুর ট্রেকিং এজেন্সি থেকে একটা ঠিক করলাম – আমাদের কাঠমান্ডু থেকে লুকলা যাওয়া ও আসার বিমানের টিকিট কাটা, TIMS Card ও বাকি এন্ট্রি ফি দেওয়া, একজন গাইড সঙ্গে দেওয়া যে আমাদের সঙ্গে থেকে থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়ে দেবে আর মালবাহক যোগাড় করা। যাওয়ার দিন স্থির হল পয়লা নভেম্বর। ব্যবস্থা যখন সব প্রায় পাকা সেসময় সুদূর কানাডায় থাকা ছোটমাসির ছেলে গৌরব আমাদের সঙ্গী হবার জন্য নাছোড়বান্দা হয়ে গেল। মেনে নিলাম।

১ নভেম্বর – কলকাতা - কাঠমান্ডু
বেলা দেড়টায় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কাঠমান্ডুগামী ফ্লাইট। কাঠমান্ডু বিমানবন্দরের ছোট টার্মিনালের ভিড় ঠেলে ব্যাগ নিয়ে প্রি-পেড ট্যাক্সি ধরে পৌঁছলাম থ্যামেল অঞ্চলে একমে গেস্ট হাউসে, সন্ধ্যে ছ'টায়। গৌরব সেখানে একদিন আগে এসে আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। হোটেলের রিসেপশনে কাগজে সাঁটা রয়েছে লোডশেডিং-এর সময়সূচি! কিন্তু সেদিন কী ভাগ্যিস আলো নেভেনি থ্যামেল অঞ্চলে। কাজ ছিল বেশ কিছু। রিসেপশনেই আমাদের সঙ্গে দেখা করল এজেন্ট দেভেন্দ্র। পরিচয় করাল গাইড রমেশ এর সঙ্গে, যে কিনা পরদিন থেকে আমাদের সঙ্গী। ভোরবেলায় আসবে পিক-আপ করতে। পরের কাজ হল কাছের এ টি এম থেকে নেপালি টাকা তুলে নেওয়া এবং স্লিপিং ব্যাগ আর ডাউন জ্যাকেট ভাড়া করা। এয়ারপোর্ট-এর বাইরে আসার পর থেকে সব জায়গায় ওয়াইফাই-এর সুবিধা পাচ্ছিলাম ফলে বাড়িতে খবর দেওয়ার কাজটা হয়ে গিয়েছিল।

২রা নভেম্বর: কাঠমান্ডু – লুকলা – ফাকডিং – মঞ্জো
চারটেয় উঠে তৈরি হয়ে ট্যাক্সি ধরে ত্রিভুবন এয়ারপোর্টের ডোমেস্টিক টার্মিনালের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। লুকলা পৃথিবীর প্রথম দশটি বিপজ্জনক এয়ারপোর্টের মধ্যে পড়ে। সকালের পরিষ্কার আবহাওয়ায় ঝুঁকি কিঞ্চিৎ কম ফলে চাহিদা বেশি। ছ'টায় গেট খোলার পর দেখা গেল কেউ যেন লাইন মেনে চলার ধার ধারছে না। সাহেব-মেমসাহেবরাও দেখলাম ঠেলাঠেলি আর গুঁতোগুঁতি করে আগে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বোর্ডিং পাস দেখে বুঝলাম এযাবৎকাল দেখা কোনো বোর্ডিং পাসের সাথে মিল নেই। ফ্লাইট নম্বর, সময় বা গেট নম্বরই লেখা নেই। সেখানে সিট নম্বরের প্রশ্নই ওঠেনা।
লুকলার ফ্লাইট খেলনা প্লেনের মত দেখতে। পনেরো আসনের ছোট ডর্নিয়ার প্লেন। দৌড়ে সবার আগে লাইন দিলাম। প্লেনের বাঁদিকের সিট দখল করাই লক্ষ্য। সেদিকেই নেপালের উচ্চ হিমালয়ের শৃঙ্গগুলির সারি স্পষ্ট দেখা যায়। পঁচিশ মিনিটের ছোট্ট সফর শেষে পাহাড়ের ফাঁক গলে একটা মাথা কাটা পাহাড়ের ঢালু চ্যাটালো রানওয়েতে প্লেনটা সহজেই নেমে পড়ল। যাক, এপিঠের যাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন!
লুকলার তেনজিং-হিলারি এয়ারপোর্টের বাইরে বেরিয়ে চোখ মেলতেই দেখি কুসুমক্যাং (৬৩৬৯ মি)। এয়ারপোর্ট থেকেই হাঁটা শুরু। একটু এগোতেই লুকলার সবচেয়ে প্রাণময় অঞ্চলে পৌঁছলাম। পাথরের রাস্তার দুপাশে সার বেঁধে দোকান। কোনও কিছুরই অভাব নেই। লুকলার ফ্লাইটে অনেকেরই পেট ভর্তি থাকলে বমির উদ্রেক করে। আমরা সে সম্ভাবনাই রাখিনি। এবার খেয়ে এগোনো হবে। ব্রেকফাস্ট সারার জন্য এক লজে ঢোকা হল। লুকলায় পৌঁছনোর পর থেকেই জিনিসপত্রের দাম সম্বন্ধে যাবতীয় আন্দাজ ওই খাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। এখানে সভ্য জগতকে বাঁচিয়ে রাখতে যা প্রয়োজনীয়, সমস্ত খাদ্যসামগ্রী সবই হয়ত ওই ফ্লাইটে করে এসেছে অথবা মোটবাহকেরা কয়েকদিন ধরে হেঁটে নিয়ে এসেছে। এরপর যত ওপরের দিকে ওঠা হবে ততই পাল্লা দিয়ে দামও চড়বে। ২০০ টাকায় ডবল ডিমের ওমলেট খেয়ে রমেশের ঠিক করা পোর্টার দুজনকে রুকস্যাক দিয়ে যে যার ব্যাকপ্যাক নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম।

নামচে থেকে থ্যাংবোচের পথে - এভারেস্ট পিরামিড ও লোৎসে

আজ মোটামুটি পুরোটাই উতরাই। গন্তব্য - ফাকদিং (২৬৫২ মিঃ)। পাথর বসানো এবড়ো-খেবড়ো ভিজে রাস্তা। এদিকটায় গাছ-গাছালি বেশি। সূর্যের রোদ সব জায়গায় সরাসরি পড়ে না। গল্প করতে করতে হাঁটছি। উলটো দিক থেকে প্রচুর লোক ফিরছে। দুধকোশী নদীকে বাঁ দিকের খাদে রেখে চেপলুং, চৌরিখারকা এসব গ্রাম ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি। এখানে একই নামের গ্রাম পরপর বেশ কয়েকটি, আর তাদের নামের শেষে রয়েছে ১,২,৩ করে নম্বর। মানে যে গ্রাম সবচেয়ে নীচে সেটা চৌরিখারকা ৬, পরের গ্রাম চৌরিখারকা ৫ এভাবে কমেছে। প্রায় সব গ্রামেই থাকার লজ আছে, বাইরেটা পরিস্কার আর সুন্দর করে সাজানো। ঘন্টাখানেক চলবার পর লোহার সরু ঝুলন্ত সেতু এল যা চওড়া নদীখাতের দুপ্রান্তের পাহাড়কে ৭০/৮০মি দূরে জুড়েছে। বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা নাগাদ প্রথম চড়াই পথের সম্মুখীন হলাম। এরপর কখনও ওঠা কখনও নামা। ফাকডিং পৌঁছে গেলাম সাড়ে বারটায়। ছবির মত সুন্দর গ্রাম ফাকদিং। নভেম্বরেও রয়েছে ফুলের বাহার। ঠিক হল শুধু বিশ্রামের জন্য না থেমে এখানে লাঞ্চ সেরে নিয়ে এগোব মঞ্জো পর্যন্ত। টোকটোক, বেনকার ইত্যাদি গ্রাম ছাড়িয়ে প্রায় চারটে নাগাদ আমরা পৌঁছলাম ছুমুয়া বলে একটা জায়গায়। ট্রেকারদের TIMS Card নেওয়ার এখানেই শেষ সুযোগ। আমাদের এজেন্টের মাধ্যমে আগেই একাজ সেরে ফেলা ছিল। ছুমুয়া থেকে আরও মিনিট পনেরো হেঁটে আমরা মঞ্জো-তে শেরপা লজে সেদিনের মত যাত্রায় বিরতি নিলাম। এখানেই রাত্রিযাপন। নেপালের খুম্বু অঞ্চলে প্রথম রাত। ভাবতেই রোমাঞ্চ লাগে। প্রথম দিনের ধকল ভালই গেছে। ফাকদিং অবধি আট আর তারপরে আরও প্রায় চার, সবমিলিয়ে মোট বারো কিমি হেঁটে মঞ্জো (২৮১৪মি) এসেছি। রাত আটটায় নেপালি ডাল-ভাত খেয়ে ঘরে গিয়ে স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

নভেম্বর ৩, মঞ্জো - নামচেবাজার

ব্রেকফাস্ট সেরে সাতটায় বের হলাম। আজকের গন্তব্য নামচে বাজার। মিনিট দশ হাঁটতেই পৌঁছলাম জোরসালে-তে, সাগরমাথা ন্যাশনাল পার্কের গেটের সামনে। এখানে এন্ট্রি ফি দিতে হয়। জোরসালে-র গেট দিয়ে ঢুকেই সিঁড়ি ভাঙা উৎরাই। প্রায় পরপর দুটো সেতু পার করে আবার দুধকোশীর বাঁ ধার দিয়ে চলেছি। অনেকক্ষণ একটানা নদীর ধার বরাবর বোল্ডার পেরিয়ে হাঁটা।

সেতু পেরিয়ে যখন উল্টোদিকের পাহাড়ে সরু রাস্তা বরাবর পাক খেয়ে উঠছি তখন বেলা সবে ন'টা, কিন্তু রোদের তাপ ও ঝাঁঝ বেশ। এক ঘণ্টা পর চ্যাটালো একটা একফালি জায়গায় পৌঁছলাম। দেখলাম আগে থেকেই চার-পাঁচজন পৌঁছে বেশ একটা হৈহৈ করছে। ব্যাপার কী? আসলে এখানে পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে এভারেস্টকে প্রথমবারের জন্য দর্শন করা যাচ্ছে। সবার আনন্দ তাই আর ধরে না! এবার ধুলোজড়ানো মেঠো চড়াই ভেঙে আমরা এগোতে থাকলাম। সাড়ে এগারটার পর একটা বাঁক পেরোতেই চোখের সামনে নামচে বাজার। কী সুন্দর গ্রামের গড়ন। অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়ের ঢাল উঁচু হয়ে পেছনের দিকে উঠে গেছে অনেকখানি। সোলোখুম্বু অঞ্চলে শেরপাদের রাজধানী এই নামচে। আস্তানা হলিডে নামচে। খিদে ভালোই পেয়েছিল, আগে ঢুকে গেলাম ডাইনিং রুমে। খাবার অর্ডার করে বাইরের দিকে চেয়ে দেখতেই কথা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। কাঁচের জানালার ঠিক বাইরেই হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যাবে বিশাল কাংটেগা (৬৭৮২ মিঃ)-কে ।

হাল্কা বিশ্রাম সেরে বেরোলাম নামচে অঞ্চলটা ঘুরে বেড়ানোর জন্য। হরেক রকম দোকান। পাশেই ব্যাঙ্ক, এ টি এম,পাব, ক্যাফে, কফিশপ, সাইবার ক্যাফে আরও কত কি! স্যুভেনির শপ, ট্রেকিং-এর জিনিসপত্রের, অন্যান্য পোশাক, নিত্যপ্রয়োজনীয় মুদি খানার দোকানে ঠাসা জমজমাট বাজার। সকালের ঝকঝকে আবহাওয়া আর নেই। নিয়ম মেনে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে বেলা দুটোর পর থেকেই আর সঙ্গে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া। ঘন্টাখানেক এদিক সেদিক ঘুরে বেলাটুকু কাটিয়ে সস্তার ইন্টারনেট-এর খোঁজ করতে করতে এক দিদির দোকানের সন্ধান পেলাম। অনেক ঝুলোঝুলির পর মোবাইলে ওয়াইফাই ব্যবহার করতে দিলেন ১০০ টাকায় আধ ঘন্টা। বাড়িতে খবর দেওয়া নেওয়া হল। নামচের পর যোগাযোগ বেশি রাখা খরচসাপেক্ষ। সন্ধ্যের পর হোটেলের ডাইনিং হলে নানা দেশের মানুষের ভিড়, তাদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে আড্ডা চলল ডিনার পর্যন্ত।

নভেম্বর ৪ - নামচেবাজার

প্ল্যান অনুযায়ী দিনটা আমাদের অ্যাক্লেমাটাইজ করে কাটানোর কথা। আর সেটার জন্য নামচের পেছনের দিকে পাহাড়ে খুঞ্জুং-এ থাকবার কথা। কিন্তু আমরা সেটা পালটে ওই গ্রাম ঘুরে নামচে ফিরে আসব স্থির করলাম। মেজাজে চলেছি কংদে রি (Kongde Ri), কাংটেগা (Kangtega), থামসেরকু (Thamserku) ইত্যাদি পিক আর পাখির ফটো তুলতে তুলতে। সিয়াংবোচে এয়ারস্ট্রিপ পার করে খয়েরি হয়ে যাওয়া ঘাসের ঢালু ময়দান-এর দু'পাশে রডোডেনড্রনের-এর সারি। তারই ফাঁকে কখনও নীলটাভা, কখনও গ্রসবীক বা অ্যাক্সেন্টর-এর দেখা মিলছে।

এভারেস্ট ভিউ হোটেল থেকে মাত্র মিনিট পাঁচেক এগিয়ে গিয়ে যে জায়গায় পৌঁছলাম সেখান থেকে ভিউ অসাধারণ। ছবি তুলে আশ আর মেটে না। বাঁদিকে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে পথ বেঁকে নেমে গেছে খুন্দের দিকে। সেদিকেই পা বাড়ালাম। অল্প এগোতেই নজরে এল বিস্তীর্ণ উপত্যকা, যেখানে খুন্দে গ্রামের অবস্থান। খুন্দে-খুমজুং আয়তনে বোধহয় নামচের পরেই। এডমন্ড হিলারি অকৃপণ হাতে দান করে গেছেন এই গ্রামকে। খুন্দের বাসিন্দারা তার প্রতিদানে হিলারিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন প্রতি বিন্দুতে - স্কুল, রাস্তা, সাইবার ক্যাফে, মুদির দোকান, সর্বত্রই তাঁর নাম ছেয়ে আছে। এমনকী গ্রামের একটু বাইরে একটা চোর্তেনও তাঁর নামাঙ্কিত।

হোটেলে ফিরে লাঞ্চ সারলাম। গৌরবের ফেরা ইস্তক মাথা যন্ত্রণা করছে, সঙ্গে অল্প কাশি। একটু বাদে জ্বরও এল। কানাডায় যতই ঠাণ্ডা পড়ুক, হিমালয়ের শৈত্য আর এই উচ্চতা দুইই ওকে কাবু করেছে।

নভেম্বর ৫ - নামচেবাজারে আরও একদিন

এদিন এগোনোর চিন্তা ত্যাগ করতে হল। মানসিকভাবে চাঙ্গা হলেও গৌরবের শরীর ট্রেকিং এর জন্য পুরোপুরি ফিট নয়। এগারো কিমি হেঁটে আরও উচ্চতায় যাওয়ার প্রশ্নই নেই। আমাদের হাতে যে অতিরিক্ত একদিন ছিল, খারাপ আবহাওয়া বা অন্যান্য অসুবিধার জন্য, সেটা আজই খরচ হয়ে গেল। এরপর আমাদের আর ঢিলে দেওয়ার সুযোগ নেই। ঠিক হল রমেশ গৌরবকে নিয়ে স্থানীয় মেডিকাল সেন্টারে ডাক্তার দেখাবে। আমরাও বসে না থেকে বেরোলাম পাখির খোঁজে। কালকে ইউরেশিয়ান আর হিমালয়ান গ্রিফন-এর দুটো দলকে আকাশে চক্কর কাটতে দেখেছিলাম। ছবি তোলা হয়নি।

গতকালের রাস্তাই ধরলাম। কিন্তু আশ্চর্যের কথা কাল যা যা দেখেছিলাম তার ছিঁটেফোঁটাও নজরে এলো না। প্রায় ঘণ্টা দুই ব্যর্থ ঘোরাঘুরির শেষে পথ বদল করে শেরপা কালচারাল মিউজিয়ামে পৌঁছলাম। পাশেই ফটো এবং আর্ট গ্যালারি। দিব্যি জায়গা। লাকপা সোনাম শেরপা নামক ফটোগ্রাফারের ধৈর্য, অধ্যাবসায় ও দক্ষতাকে কুর্নিস। তিনি সম্ভবত এ অঞ্চলের প্রতিটি চূড়া আরোহণ করে সেখানে বিভিন্ন ঋতু ও সময়ে ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে তুলে বড় আকারে প্রিন্ট করে এক্সিবিশনের জন্য সাজিয়ে রেখেছেন। ফটোগুলো দেখেই প্রশংসা করার আগে মাথায় প্রশ্ন আসে -"তুলল কি করে?" ফটোর ফটো তুলে আর বাকি স্যুভেনিরের আকাশছোঁয়া দাম শুনে ফেরার রাস্তা ধরলাম।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে বুঝলাম জায়গাটায় এসে ভুল করিনি। মিনিটখানেকের মধ্যেই বেশ কিছু রেডস্টার্ট, বিভিন্ন টিট, ফুলভেট্টা, চুঘ ইত্যাদির দর্শন পাওয়া গেল। দশ মিনিট হেঁটে যে জায়গাটায় পৌঁছলাম সেখানে তখন আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। আর রয়েছেন হাতে ভারত, নেপাল আর ব্রিটিশ অভিযানের পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তেনজিং নোরগের বিশাল স্ট্যাচু। ব্যাকগ্রাউণ্ডে সার দিয়ে আমাদাবলাম, লোৎসে আর সাগরমাথা! মজার ব্যাপার গতকালের এভারেস্ট ভিউ হোটেলের থেকে দেখা দৃশ্যপট অবিকল আবার চোখের সামনে। দূরে নজর করলে থিয়াংবোচে-কেও দেখা যাচ্ছে, যেখানে আজ যাওয়ার কথা ছিল।

ফিরে এসে গৌরবের সাথে কথা বলে বুঝলাম বুকে সর্দি জমেছে। ডাক্তার ওষুধ দিয়েছেন বটে কিন্তু আদৌ ও এরপর এগোতে পারবে কিনা সেটা স্পষ্ট নয়। এদিকে আমাদের আর অপেক্ষা করার মত দিন নেই।

দেবুচের জঙ্গলে ঘেরা পথ

নভেম্বর ৬ - নামচে থেকে ডেবুচে

প্ল্যান মাফিক চলা শুরু হল, গন্তব্য থিয়াংবোচে বা থেংবোচে। পোর্টাররা আগে যাচ্ছে। আমি আর রমেশ কথা বলতে বলতে ওদের পরে চলেছি। শান্তনু আর গৌরব সবার শেষে। তিন রাত নামচে-তে থাকার ফলে অ্যাক্লেমাটাইজেশনটা ভালই হয়েছে। খুন্দের দিকের টানা চড়াই এদিকে নেই, অপেক্ষাকৃত ঢালু পথ পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়েছে। গ্রাম ছাড়িয়ে একটু ফাঁকা জায়গা পেরোতেই ডানদিকে রাস্তা থেকে নীচুতে দেখলাম একজোড়া হিমালয়ান মোনাল! আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও সংবরণ করলাম। এভারেস্ট এর মতই মোনাল দেখবার সাধ ছিল অনেকদিন। যদিও দূরে থাকায় ক্যামেরায় ভাল ছবি তোলা গেল না, কিন্তু সঙ্গের বাইনোকুলারে তার রঙের ছটায় অভিভূত হয়ে পড়লাম। একটু বাদে খেয়াল হল শান্তনু ও গৌরব ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। গৌরবের শ্বাসকষ্ট দেখে রমেশের সঙ্গে আলোচনায় স্থির হল ওকে নামচেতে ফেরত পাঠানো হবে। একজন কুলি - ঈশ্বর, সঙ্গে থাকবে। রমেশ ওকে পৌঁছে দিয়ে পরদিন রওনা হবে। ডিংবোচে-তে একদিন বিশ্রামের জন্য রাখা আছে। সেদিন ও দলে ফের যোগ দেবে। অন্য কুলি দুর্গাকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব থিয়াংবোচের দিকে। গৌরবের সঙ্গে টাকা, এ টি এম কার্ড, নেপালি সিম কার্ড সহ ফোন, ওষুধ ইত্যাদি দিয়ে ভগ্নহৃদয়ে দল ভাগ করে দুদিকে যাত্রা শুরু করলাম। এদিকে বেলা অনেক গড়িয়ে গেছে। দুপুরের মধ্যে আমাদের পৌঁছনো উচিত ছিল। সুতরাং দুর্গা বেশ তাড়া লাগাতে শুরু করল। রমেশ ভালই ইংরেজি জানে বলে কথাবার্তা সহজে হচ্ছিল, কিন্তু দুর্গা শুধু "থ্যাঙ্ক ইউ" টাই জানে বোধহয়। যে কথাই বলি- উত্তর আসে শুধু থ্যাঙ্ক ইউ তেই। "আর কতদূর" - থ্যাঙ্ক ইউ , "ইংরেজি বুঝতে পার?" - থ্যাঙ্ক ইউ, "রমেশ আমাদের থাকার ব্যাপারে কি বলেছে?" - থ্যাঙ্ক ইউ । মহা জ্বালা!

প্রায় চল্লিশ মিনিট উৎরাই শেষে পৌঁছলাম ফুঙ্গি থাঙ্কা (৩২৫০মি)। নামচের প্রায় ২০০ মিঃ নীচে। এরপর পুরোটাই চড়াই, কারণ থিয়াংবোচে ৩৭০০ মিঃ-এ। কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে চকোলেট ও জলপান শেষে যাত্রা শুরু। এতক্ষণ পথে বিভিন্ন জায়গায় জলের প্রাচুর্য থাকায় আমাদের ধারণা ছিল এর পরেও সেটার অভাব হবে না। সুতরাং অতিরিক্ত জল বয়ে নিয়ে চলা অর্থহীন। এই সিদ্ধান্ত যে আমাদের কতবড় ভুল তা কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেলাম। ফুঙ্গি থাঙ্কায় দুধকোশীর ওপর পুল পেরোনোর পর রাস্তা মনে হল আকাশে উঠে গেছে। ওপরের দিকে তাকালে শেষ খুঁজে পাওয়া যায়েনা। হাঁটতে শুরু করলাম মহা উদ্দ্যমে। তবে তা খুব বেশিক্ষণ চলল না। প্রথম দিকে আমরা পনেরো মিনিট উঠে একবার করে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। দু'তিনবারের পরেই দেখা গেল অতি ঘন ঘন দাঁড়াচ্ছি। ওদিকে দুর্গার অবস্থাও ভাল না। আমাদের দুজনের রুকস্যাকের ওজন পঁচিশ কেজি হবে, সেটা নিয়ে ও উঠছে। ফুঙ্গি থাঙ্কা সেতু পেরিয়ে হাঁটা শুরু করেছি বারটা থেকে। বেলা দেড়টার পর দম আর জল দুটোই একদম ফুরিয়ে এল। এদিকের রাস্তায় অনেকটা বড় বড় পাথরের ধাপ খাড়া উঠে গেছে। যদিও সে ধাপ মানুষের হাতে বানানো নয়। ভীষণ পাথুরে, আর সঙ্গে ধুলো-কাঁকরের মিশ্রণ, একটু পা ফসকালেই নুড়ি- কাঁকরে হড়কে যায়। এই ধরণের পথে চলতে সময় বেশি লাগে, কষ্টও হয় বেশি। ক্রমে বিশ্রামের মধ্যে ব্যবধান পাঁচ মিনিট হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেরাই ভাবছি এরকম চললে কখন পৌঁছব? গায়ের জামা ঘামে ভিজে একসা হয়েছে। শরীর থেকে জল বেরিয়ে গিয়ে খুব দুর্বল লাগছিল। পথে একবার কয়েকজন রাশিয়ান অভিযাত্রীদের কাছ থেকে জল চেয়ে খেতে বাধ্য হলাম। ইতিমধ্যে দুর্গা আমাদের পেরিয়েছে। সত্যি ভাবতে অবাক লাগে এই নেপালি কুলিরা কি অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী। দুর্গার শরীরের ওজন মেরে কেটে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ কেজি হবে। পিঠে আমাদের পর্বত প্রমাণ দুটি রুকস্যাক নিয়ে যখন চলছে তখন তাকে প্রায় দেখাই যায় না। কিন্তু প্রবল শারীরিক সক্ষমতায় একবার হাঁটা শুরু করলে পনের-কুড়ি মিনিটের আগে থামে না। দুর্গার মত এরকম অনেক পোর্টারকে দেখে মনে হয় এক্ষুনি হয়ত শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে যাবে নয়ত মুখ থুবড়ে পড়বে। কিন্তু আমাদের সমতলের শহুরে ধারণায় জল ঢেলে ওরা এগিয়ে চলে, আমাদেরই জন্য, আমাদেরই মাল বহন করে।

রাস্তায় জানতে পারলাম থিয়াংবোচে-তে থাকবার জায়গা হাতে গোনা । অর্থাৎ দেরি করে গিয়ে পৌঁছলে থাকবার জায়গা নাও পাওয়া যেতে পারে! তখন উপায়? উত্তর এল - যেতে হবে হয় ডেবুচে নয়ত প্যাংবোচে। থিয়াংবোচে থেকে দু-তিন কিমি উৎরাই নামলে ছোট গ্রাম ডেবুচে। সেখানে গুটিকয়েক থাকবার জায়গা। না হলে যেতে হবে প্যাংবোচে। কিন্তু তা আরও তিন ঘন্টার দূরত্বে। শুনে আমাদের আত্মারাম বুকে ধাক্কা মেরে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। গত এক ঘন্টায় উলটো দিক থেকে আসা যাকেই জিজ্ঞাসা করেছি , "থিয়াংবোচে আর কতদূর" , উত্তর এসেছে "এই তো আর একটু"। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে থাই-এর পেশীগুলো যেন আড়ষ্ট, আর কাজ করতেই চাইছে না। দুজনেই পা টেনে টেনে এগোচ্ছি। ক্ষিদের চোটে চকলেট খেয়েছি কিন্তু তাতে তেষ্টা বেড়েছে। একটা করে খাড়া বাঁক টপকাই আর মনে হয় এবার বুঝি শিখর দেখতে পাব। কিন্তু কোথায় কী?

বেলা আড়াইটে বাজল। আর কেউ পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে না। হয়ত আমরাই সবার পেছনে। আমাদের জন্য কোন ঘর ফাঁকা থাকবে কি? উঠতে উঠতে হঠাৎ দেখি দুর্গা হাত পা নেড়ে ডাকছে। বেশ উত্তেজিত। ব্যাপার কী? চেঁচিয়ে কথা বলার সাহস বা শক্তি কোনটাই নেই, তাও আবার দুর্গার সঙ্গে! কোনরকমে কাছে এগিয়ে দেখি একটা ঝরনা। ঠাণ্ডা জলধারা বয়ে চলেছে। খাওয়ার যোগ্য তো? দুর্গা ইশারা করতেই বোতলে ভরে আকণ্ঠ পান করলাম। শরীর একটু জুড়োতেই উদ্যম ফিরে এল। আশার কথা, একদম কাছেই এসে পড়েছি থিয়াংবোচের। সত্যিই আর দশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। কিন্তু থাকার জায়গা আছে তো? সময় নষ্ট না করে দুর্গা খোঁজ নিতে চলে গেলো আর কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে বোঝালো আশঙ্কাটাই সত্যি হয়েছে। সুতরাং না দাঁড়িয়ে চল ডেবুচে।

আকাশে মেঘ জমছে। মনেও দুশ্চিন্তার মেঘ। ডেবুচের দিকে সবে পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ দেখি পেছনে বেশ কিছু ট্রেকারের ভিড়। সবাই ডেবুচের দিকেই আসছে। অর্থাৎ এরাও থাকবার ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। ঠিক করলাম যেমন করে হোক এই দলটার আগে আমাদের পৌঁছতেই হবে। চারদিকে আমাদাবলাম, কোয়াং দে, থামসেরকু, লোৎসের মত পিক, বিখ্যাত থিয়াংবোচে মনাস্ট্রি , শরীরের ক্লান্তি ও খিদে - সব কিছুকে উপেক্ষা করে আমরা প্রায় দৌড়ে নামতে শুরু করলাম। দুদ্দাড়িয়ে পনেরো-কুড়ি মিনিটেই পার করলাম পথটা। লজে পৌঁছে পরের আধঘন্টায় একটু ফ্রেশ হয়ে একবাটি করে স্যুপ খেয়ে যখন খালি পায়ে লজের সামনের ঘাসে পায়চারি করছি তখন কোথায় ক্লান্তি আর আশঙ্কা। সব দূর হয়ে গিয়ে শুধুই মনোমুগ্ধকর দৃষ্টিতে প্রকৃতির দিকে চেয়ে থাকা।

দিন শেষের সূর্য চোখের সামনে আসতে আসতে পশ্চিমের শৃঙ্গগুলির পেছনে বিদায় নিল। সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা লাফিয়ে নামতে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে ডাইনিং রুমে হিটারের পাশে জড়ো হলাম। সেখানে ততক্ষণে জমায়েত হয়েছে লজের সব ট্রেকার। গা ঘেঁষাঘেষি করে বসে সবাই হিটারের উত্তাপ থেকে নিজেকে সেঁকে নিচ্ছে। আলাপ হল সকলের সঙ্গে - কেউ শিক্ষক, কেউ শেফ, কেউবা আমার মতো সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। পাহাড়ের প্রতি অমোঘ আকর্ষণে

সোমারে থেকে মাউন্ট লোৎসে

নভেম্বর ৭ - ডেবুচে,প্যাংবোচে, সোমারে, ডিংবোচে
সকালে ঘুম ভেঙে উঠে পরিস্কার আকাশে, বরফ মাখা পাহাড়চূড়োয় সূর্যের আলো দেখেই গতকালের কষ্টের কথা একেবারে ভুলে গেলাম। তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম সাড়ে সাতটায়। ডেবুচে এবড়োখেবড়ো চ্যাটালো জমির ওপর জঙ্গলে ঢাকা গ্রাম। দুপাশে নানা আকারের রডোডেনড্রন ,বার্চ, জুনিপার, পাইন ও অন্যান্য গাছের ঘন জঙ্গল। পাতা প্রায় সব গাছেই কমে এসেছে এই নভেম্বরে, তবু সবজে আভা রয়ে গেছে চারপাশে। প্রায় মিনিট পঞ্চাশ চলার পর পথ নীচে নেমে গেছে ইমজে খোলার বুকে। বড় বড় পাথরের আড়ালে দূরে একটা সাঁকো পার করে আবার পথ এসে উঠেছে প্রায় সমান উচ্চতায়। ওদিকে নদীর বুক থেকে যেন আমাদাবলাম সোজা উঠে গেছে আকাশের দিকে। দুপাশের পাহাড়ের আড়ালে আর কোন বরফঢাকা উঁচু শৃঙ্গ চোখে পড়ছে না। সাঁকো পার হবার খানিক আগে জোরে হাওয়া বওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখি রকফল হচ্ছে - পাহাড়ের গা বেয়ে পাথর ঝরে পড়ছে। একটু অপেক্ষা করে দ্রুত বড় বোল্ডার পার হয়ে, সাঁকো পার করে পাহাড়ের অপর ঢালে পৌঁছলাম। এই চড়াইটার শেষে গুম্ফার তোরণের মত একটা দ্বার পেরিয়ে দেখি পথ সমান হয়েছে। এর পর প্রায় মিনিট কুড়ি পথ চলে, সকাল থেকে প্রায় দু'ঘন্টা একটানা এসে প্যাংবোচে পৌঁছলাম। কাল ডেবুচেতে থাকার জায়গা না পেলে হয়েছিল আর কি! আজ সকালের তরতাজা শরীরে দু'ঘণ্টা লেগেছে, সেখানে কাল এলে কী হত আর ভেবে লাভ কী?
প্যাংবোচের অসাধারণ সৌন্দর্যের কথা বইতে পড়েছিলাম। গ্রামখানি বেশ বড়। শীতের ঠিক আগে লালচে হয়ে যাওয়া পাতা ভরা গাছে অদ্ভুত রঙের ফুলঝুরি। ৪০০০মি উচ্চতার এই গ্রামে থাকার জায়গা অনেক। প্রায় সব বাড়ির সামনেই সুযোগ সুবিধার বহর সাইনবোর্ডে লেখা - ওয়াইফাই, ঘোড়া ভাড়া, হেলিকপ্টার সার্ভিস, অক্সিজেন, টেলিফোন, ব্যাটারি রিচার্জ, মেমরি কার্ড - কী নেই! আরও দেখলাম গ্রামের নামের আগে খুমজুং - ৭ লেখা আছে। আমাদাবলাম এখানে ডান দিকে অনন্য মুহূর্ত তৈরি করছে প্রতি ক্ষণে। তার সঙ্গে লোৎসে সার ও পেছনে উঁকি মারা এভারেস্ট পিরামিড। সামনে ভাল করে নজর করলে সোমারে গ্রামকেও দেখা যায়। না থেমে এগিয়ে চললাম। সোমারে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা বেশি বাড়েনি। কিন্তু দশটা বাজতে না বাজতেই বেশ খিদে পেয়ে গেছে। আগের দিনের ভুল আর না করে প্রথম খাবারের দোকানে ঢুকেই অর্ডার করে ফেললাম। কিছুক্ষণ ফাঁকা সময় পাওয়া গেল ভেবে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় ছোট কোন পাখির তীক্ষ্ণ কিন্তু চাপা আওয়াজ পেয়ে সন্তর্পণে এগোলাম। ভাবিনি এখানে আসে পাশে প্রচুর ব্ল্যাক ফেসড লাফিংথ্রাসের মাঝে রেন ব্যাবলার দেখতে পাব।
সোমারে থেকে রাস্তা এগিয়েছে বুগিয়াল মতো অঞ্চল জুড়ে। পথের কষ্ট কিছুটা কমে যাওয়ায় দুচোখ ভরে দুপাশের দৃশ্য দেখি আর ক্যামেরার শাটার টিপি। আবার তারপরেই দেরি হওয়ার ভয়ে দ্রুত এগিয়ে চলি। ঘণ্টাদেড়েকের পথ চলার পর হঠাৎ একটাই সবুজ টিনের চালওয়ালা বাড়ি চোখে পড়ল এই উন্মুক্ত প্রান্তরে। লেখা রয়েছে -"সানরাইজ গেস্ট হাউস , ওর্সো ৪০৪০ মিঃ"। বাপ রে , কার এখানে শখ হয়েছে গেস্ট হাউস বানানোর! সোমারের পর বড় গাছ আর নেই, শুধু ছোট ঝোপ এদিকে ওদিকে। এর পর কিছুটা এগোতেই রাস্তা দুভাগ হয়েছে, বাঁদিকে অপেক্ষাকৃত উঁচু পথটা চলে গেছে ফেরিচের দিকে। আমরা যাব ডানদিকের রাস্তা ধরে, যা প্রথমে নীচে নেমে গেছে নদীর বুকে। এরপর খুম্বু খোলার ওপরে সাঁকো পেরিয়ে ডাইনে ঘুরে পাহাড়ের ঢাল বরাবর চলে গেছে। সেই রাস্তা নীচে ইমজে খোলাকে সঙ্গী করে এগিয়ে গেছে ডিংবোচের দিকে। ৪০০০মি পার করলেই শরীরকে খাপ খাইয়ে নিতে একদিন বিশ্রাম নেওয়া উচিত। ডিংবোচে (৪৪১০মি) আর ফেরিচের(৪২৪০মি) উচ্চতা প্রায় এক। কিন্তু ডিংবোচের তুলনায় ফেরিচে পাহাড়ের যে ঢালু উপত্যকায় রয়েছে সেদিকে ঠাণ্ডার প্রকোপ বেশি। তাই গ্রামে লোকজনও কম।
বেশ অবাকই হলাম যে বেলা একটার মধ্যেই এমন এক জায়গায় এসে পড়লাম যেখান থেকে পুরো ডিংবোচে দেখা গেল। ডিংবোচের বাইরে একটা ছোট চোর্তেন। এখানকার চোর্তেনগুলোতে বৌদ্ধদের রঙিন নিশান যেমন আছে, আবার তেমনি ওপরের দিকে চোখ আঁকা থাকে। যা নেপালের চোর্তেনের বৈশিষ্ট্য। ডিংবোচে গ্রাম ইমজে খোলার ডানধারে লম্বালম্বি অবস্থিত। আর বামধারে আমাদাবলামের উত্তর-পশ্চিম পিঠ খাড়া নেমে এসেছে। সামনের দিকে চাইলে দেখতে পাওয়া যায় বিখ্যাত আইল্যাণ্ড পিক, লোৎসে, লোৎসে সার,বরুণৎসে ইত্যাদিকে। এভারেস্ট পিরামিড এখানে লোৎসের পেছনে ঢাকা পড়ে গেছে। আইল্যাণ্ড পিকের আশেপাশে অনেক জানা-অজানা শৃঙ্গের ভিড়।
আমরা এসে উঠলাম হোটেল ফ্যামিলি ডিংবোচে-তে। যদিও দুপুর আর অল্প খিদেও পেয়েছে, কিন্তু সোমারেতে ভাত খেয়েছিলাম বলে এখন চকোলেট খেয়ে কাটালাম। বাইরে বেশ খটখটে রোদ, কিন্তু ৪০০০ মিঃ-এর ওপরে বলে বেশ ঠাণ্ডা। গাছ নেই বলে হাওয়া কোথাও বাধা পাচ্ছে না। রোদে বসে নতুন প্রতিবেশিদের সঙ্গে আড্ডায় মেতে উঠলাম। কিন্তু খানিক পরেই আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করল। ঝোড়ো হাওয়া। ঘরে ঢুকে এসে দেখি যেদিক থেকে উঠেছি সেদিক থেকে একরাশ ঘন মেঘ এসে সবকিছুকে ঢেকে দিল। রোদের জন্য যে আরামদায়ক অনুভূতি ছিল তা উধাও। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে বিকেল পাঁচটায় দিনের আলো থাকা সত্ত্বেও ঠকঠকানি লেগে গেলো হাড়ে। শেষে দুজনে ঠিক করলাম ডাইনিং হলে যাই, সেখানে নিশ্চয়ই চুল্লি জ্বালিয়ে ফেলেছে এতক্ষণে। নীচে নেমে সেখানে পৌঁছতেই আমরা অবাক। দেখি রমেশ বসে গরম স্যুপ খাচ্ছে। আমরা ভেবেছিলাম ও হয়ত আগামীকাল আসবে, আমাদের এখানে যে অ্যাক্লিমাটাইজেশনের জন্য অতিরিক্ত একদিন রাখা আছে, সেদিনে। কিন্তু ও আজ নামচে থেকে বেরিয়ে একটানা ট্রেক করে পৌঁছেছে এই ডিংবোচেতে, তাও শেষের এই খারাপ আবহাওয়ায়। ওকে দৃশ্যতই ক্লান্ত লাগল। নেপালের এই অসীম শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার অধিকারী শেরপারাও তাহলে ক্লান্ত হয়! অতিমানব নয় তাহলে সবাই! ইতিমধ্যে ডাইনিং রুম বিদেশি ট্রেকারদের ভিড়ে গমগম করছে। গল্পগুজব করে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে বিছানায় স্লিপিং ব্যাগের ভেতর আশ্রয় নিলাম।

নভেম্বর ৮ - ডিংবোচে
এদিনটা রাখা ছিল বিশ্রাম আর অ্যাক্লিমাটাইজেশনের জন্য। সারাদিনের কাজ বলতে চুকুং রি বা তার বেস ক্যাম্প অবধি যাওয়া - আইল্যান্ড পিকের দিকে এগিয়ে বিবরে পেরিয়ে। বিকল্প ছিল হোটেলের পেছন দিকে যে খাড়া বরফহীন পাহাড় আছে ৫১০০মিঃ পর্যন্ত সেই পথে এগোনো। চুকুং গেলে ৪৭৩০ মিঃ, তাই ঠিক হল পেছনের নাগার্জুনাতেই যাব।
তাড়াহুড়ো নেই। ব্রেকফাস্ট সেরে বেশ অলস ভাবেই উঠতে শুরু করলাম। চূড়ো অবধি না পারলেও যতটা যাব ততটাই শরীরের পক্ষে লাভ। ওদিকে আগামী তিনদিন ট্রেকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়, কঠিনও বটে। সুতরাং শরীরকে কষ্ট না দিয়ে, চোট আঘাত থেকে বাঁচিয়ে, শুধু সক্ষমতা বাড়ানোর মহড়া। দুর্গার পিঠে আজ স্যাক নেই। সে নিজেকে চড়ুইপাখি ভাবছে মনে হচ্ছে দেখে, তিড়িং-বিড়িং করে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে। রমেশ ও দুর্গা আজ নিজেদের স্বাভাবিক গতি ও ছন্দে চলেছে, মাঝে মাঝে পাথরের ওপর বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। উচ্চতামাপক কোন যন্ত্র বা চিহ্ন নেই। যতটা পারি চূড়োর কাছাকছি পৌঁছে মনে হল যথেষ্ট গা ঘামানো হয়েছে। উচ্চতার সঙ্গে শরীরকে খাপও খাইয়ে নেওয়া যাচ্ছে। এবার ফেরাই ভালো।
গ্রামে ফিরতে বেশি বেলা হয়নি। প্রথমে খানিকক্ষণ ওয়াইফাই-এর খোঁজে এদিক সেদিক ঘুরলাম। হোটেলের রেটটা বেশি। কিন্তু আধ ঘন্টাটাক ঘোরাঘুরি করে খুব একটা সুবিধে করতে পারা গেল না, গ্রামটা ভাল করে ঘুরে দেখা ছাড়া। শুধু একবার স্নো পিজিয়ন দেখতে পেয়ে তার ছবি তুললাম। হোটেলে

ফিরে ওয়াইফাই দিয়ে ইন্টারনেট সংযোগে বাড়িতে খবরাখবর দেওয়া নেওয়া সেরে নিলাম। গৌরবের সঙ্গেও যোগাযোগ হয়েছে। বাকি পুরো দিনটা নির্ভেজাল আড্ডা। আজ অনেক ট্রেকার এসে জুটেছে। ভারতীয় বলতে আমরা দুজনই। ডাইনিং হলে জার্মান অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার আন্দ্রে আমান-এর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ গল্প হল। এঁর সঙ্গে কাল এসেই পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। উনি আমাদের যাত্রাপথ মেনে চলবেন বাকি রাস্তাটা। খাওয়া দাওয়ার পর ফুটফুটে চাঁদের আলো মাখা আমাদাবলামের রাতের রূপ ক্যামেরাবন্দি করার লোভ সামলাতে পারলাম না। প্রায় আধ ঘন্টা ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ছবি তুলে, ব্যাটারির কথা ভেবে ঘরে ফিরে এলাম। সব জায়গায় ব্যাটারি চার্জ করার সুযোগ নেই।

নভেম্বর ৯: ডিংবোচে থেকে লোবুচে

আজকের গন্তব্য লোবুচে খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু বেশি উচ্চতায় একটানা অনেকক্ষণ পথ চলা যায় না। প্রথমেই ডিংবোচের গায়ে নাগার্জুনা পাহাড়ের একটা রিজ পেরোতে হল। এই পাহাড়ের উলটো দিকের ঢালেই ফেরিচে। নাগার্জুনার এই রিজ-এর প্রাচীরই ডিংবোচেকে প্রবল ঠাণ্ডা হাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। রিজ পার হওয়ার পর রাস্তা দুভাগে ভাগ হয়েছে। একটা উঠে গেছে শৃঙ্গের দিকে, যে পথে আমরা কাল গেছিলাম। অন্যটা যেদিক থেকে উঠেছি তার বিপরীত দিকে সটান নেমে গিয়ে মিশেছে দুজা বুগিয়ালে। বুগিয়ালে ঢাল প্রায় নেই বললেই চলে এবং লম্বায় খুব দীর্ঘ। ৩-৪ কিমি পর্যন্ত পায়ে চলার রাস্তা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। জোরেই হাঁটছি। কিন্তু শত্রুএখানে দম। দেখলে মনে হয় এই সামান্য ঢালু রাস্তায় চলা খুব সহজ, কিন্তু একটু গতি বাড়ালেই হাঁপিয়ে পড়ছি।

দিগন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর মানেই হাওয়ার অবাধ বিচরণ। বড় গাছ দুদিন আগে প্যাংবোচেতে শেষবার দেখেছি, এখানে এরপর ঘাসও শেষ হয়ে এল। বেলা একটু বাড়তেই সামনের দিক থেকে হাওয়া গতিরোধ করছে। দুজা বুগিয়ালে অসংখ্য চ্যপকে (ইয়াক ও গরুর সঙ্কর), ইয়াক, অল্প কিছু ঘোড়া ও ভেড়া চড়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাথরের দেওয়ালে ঘেরা ঘর চোখে পড়ে, বোধহয় আস্তাবল হবে। বুগিয়াল পার হয়ে রাস্তা ঢালু পথে নদীখাতে নেমেছে। সেদিকে এগোতে এগোতে দেখি বাঁদিকে পাহাড়ের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে সোলা-সো বা সোলা লেক। আসলে এই পথ কিছুক্ষণ বাদে মিশে যাবে গোকিও হ্রদের দিক থেকে আসা পথের সঙ্গে। খুম্বু খোলার ওপরে ছোট পুল পার করেই থুকলা বা ধুকলা (৪৬২০মি), যেখানে বিশ্রাম নেওয়ার পালা। এখানে বিশ্রাম নেওয়াটা বাধ্যতামূলক। কেন? রমেশের কাছে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্নটা করতেই ও একটু হেসে আঙ্গুল তুলে গন্তব্যের দিকটা দেখাল। রাস্তাটা খাড়া ওপরে উঠেছে প্রায় ১১০০ ফুট। এই তার মানে থুকলার কঠিন রাস্তা!

থুকলায় দুটো দোকান আছে, আর আছে তিন-চারটে থাকার জায়গা, সবশুদ্ধু চত্বরটা ধর্মতলার সিটিসি বাসস্ট্যান্ডের সিকিভাগ। দোকানগুলোয় ওয়াইফাই-এর সুবিধা আছে। খাবারের মূল্য তালিকা আমাদের প্রায় হার্ট অ্যাট্যাক দিয়ে দোকান থেকে বার করে দিল। সঙ্গে থাকা জিওলিন দেওয়া জল আর স্নিকার্স চকোলেট দিয়ে নিজেদের রিচার্জ করে বের হলাম। চড়াই থিয়াংবোচে আসার সময়েও পেয়েছি, কিন্তু এখানে তফাৎ হল উচ্চতা - সেদিনের থেকে ১০০০মিঃ-এর চেয়েও বেশি উচ্চতায়, গাছ একদম নেই ফলে অক্সিজেনের খামতি। কিন্তু একটাই জিনিস সেদিনের থেকে আজকে আলাদা করছে, সেটা হল লক্ষ্য। সেদিন পাহাড়ে পাক খেয়ে উঠতে গিয়ে শেষটা যে কোথায় তা বোঝা যাচ্ছিল না, এখানে কিন্তু চূড়োটা দেখা যাচ্ছে। ফলে আত্মবিশ্বাসে ধাক্কা কম লাগে। রাস্তা জিগজ্যাগ করে উঠেছে, পাথরের ধাপ আছে। আমরা শুরু করার পর অনেকেই আমাদের পেছন থেকে এসে টপকে গেল। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে কারোর অবস্থা ভাল নয়। হাঁপাতে হাঁপাতে এগোচ্ছে সবাই। আমরাও লড়ছি। ইয়াক আর চ্যপকেগুলো পিঠে মাল নিয়ে যখন উঠছে তখন ওদের শ্বাসপ্রশ্বাস-এর শব্দ বোধহয় ১০ মিটার দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ক্রুদ্ধ ইয়াক এই বুঝি কাউকে আক্রমণ করবে।

একসময় দেখি সামনে প্রায় ৫০ গজ দূরে শান্তনু মাথার ওপর মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে দিয়েছে। বড় বোল্ডারগুলো টপকে ওখানে পৌঁছে আমারও আনন্দের সীমা রইল না। অদ্ভুত দৃশ্য। চূড়োর খাঁজ পার করেই এক চওড়া সমতল মত জায়গা, পাথরের কিয়ার্ন দিয়ে বানানো চোর্তেনে রঙিন নিশান উড়ছে, চতুর্দিকে বড় বরফঢাকা শৃঙ্গ। সমতল অঞ্চল জুড়ে এভারেস্ট অভিযানের হতভাগ্য শহীদদের স্মৃতিসৌধ। রয়েছে ১৯৯৬ সালে এভারেস্ট বিপর্যয়খ্যাত স্কট ফিশার-এর মেমোরিয়াল। এছাড়াও বাংলাদেশী পর্বতারোহী সজল খালেদ, অস্ট্রিয়ান সিন এগান,কত বুল্গেরিয়ান, চাইনিজ এর সঙ্গে রোমানিয়ান হৃষ্ট প্রোদানভ-এর সৌধও চোখে পড়ে। যিনি বিনা অক্সিজেনে পশ্চিম রিজের রুটে এভারেস্ট শীর্ষে ১৯৮৪ তে ওঠেন। এই স্মৃতিসৌধের মাঝে দাঁড়িয়ে ওঁদের জীবনকাহিনীর কথা ভেবে অজান্তেই চোখে জল আসে।

রমেশের হাঁকডাকে আবার চলা শুরু হল। স্নো লাইনে ঢুকে পড়েছি। এতদিন পাহাড়ের ওপরের ঢালে বরফ দেখেছি। নিজেরাই এখন প্রায় ৫০০০ মিঃ এর কাছে পৌঁছে যাওয়ায় আশেপাশে পথে বরফের দেখা মিলল। নদীর ওপারে পাহাড়ের পেট বরাবর একটা রেখা চলছে আমাদের সমান্তরালে। ভাল করে নজর করলে দেখা যায় ওটা পায়ে চলা পথ, গোকিও হ্রদ থেকে চো-লা, জং-লা অতিক্রম করে লোবুচের দিকে আসা পথ। দুই পথ মিশেছে খুম্বু খোলার অপর পারে। খোলায় জল কম, সহজেই বোল্ডার টপকে পেরোনো গেল। একদল ইউক্রেনিয়ান ট্রেকারের সাথে গল্প করতে করতে বাকি রাস্তাটুকু পেরিয়ে গেলাম।

লোবুচের উচ্চতা প্রায় ৪৯০০ মিঃ। এখানেও থাকার জায়গা সত্যিই কম। ১৯৭৫-এ কমলা মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা পড়ে জেনেছিলাম তখন ছিল একটি মাত্র দোকানঘর। এখন সে তুলনায় অনেক আধুনিক সুবিধা আছে , সন্দেহ নেই। সে যাই হোক, ডিংবোচে-তে লজের লোকের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ ছিলাম, লোবুচে-তে আঙ্কেলজীর "হোটেল পিক XV"-এ ঢুকে মনটা খুশিতে ভরে গেল। এটা বাড়ির মধ্যেই হোটেল। আঙ্কেলজীর সঙ্গে কথা বলে জানলাম ওনার দুই ছেলে দার্জিলিং আর কার্শিয়াং-এ পড়াশোনা করে। ছুটিতে বাড়ি আসে। মানে ওরা বছরে দুবার প্রায় এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্রেক করে! আঙ্কেলজী আমরা ভারতীয় শুনে একটু খাতির করে অনেক গল্প করলেন। সদা ব্যস্ত, তার মধ্যেও যত প্রশ্ন করেছি, সবেরই উত্তর দিয়েছেন।

মালপত্র রেখে, খানিক বিশ্রাম নিয়ে লাঞ্চ সারলাম। এই উচ্চতায় সুস্থ থাকতে রসুনের স্যুপই যথার্থ। খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে বের হলাম অ্যাক্লিমাটাইজেশনের জন্য পদচারণায়। দুপুরে ঘরে বসে সময় নষ্টের কোন মানে হয় না। রমেশ সঙ্গে আসতে চাইল না। শুধু বলল আবহাওয়া বুঝে বেশিদূর যেন না যাই। পথ বলতে কিছু নেই প্রায়, শুধুই ছোট বড় বোল্ডার। কষ্ট বলতে এখন শুধু চড়া রোদের সঙ্গে দমকা হাওয়া আর সারাদিনের ক্লান্তি। কুড়ি-পঁচিশ মিনিট ওই বোল্ডার টপকে এগিয়ে একটা টিলার ওপর উঠে প্রাণ ভরে নুপৎসে আর পুমোরি এর অসাধারণ শোভা দেখে সে ক্লান্তিও উধাও। রোদ পড়তেই জাঁকিয়ে ঠান্ডা। জোরে পা চালিয়ে লজে ফিরে এলাম। এর পর রোজকার রুটিন।

ভোরের এভারেস্ট শিখর

নভেম্বর ১০ - লোবুচে, গোরখশেপ, বেস ক্যাম্প, কালাপাথর

লোবুচের পর রাস্তা বলতে কিছু নেই। শুধু ছোট-বড় বোল্ডার। কিছুক্ষণ পরেই মাটি একেবারে শেষ হয়ে কেবল এবং কেবল মাত্র পাথর রয়ে গেল পায়ের নীচে। আসলে এগুলো খুম্বু গ্লেসিয়ারের টার্মিনাল আর ল্যাটেরাল মোরেন। আজ পথ চলা শুরু করেছি ভোর সাড়ে ছ'টায়। সূর্যের প্রথম আলো যখন পুমোরির ওপর পড়ছে তখন আমাদের প্রায় আধ ঘন্টাটাক হাঁটা হয়ে গেছে। অসাধারণ চোখ ধাঁধানো দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে এগোচ্ছি। সকালে ভালই ঠাণ্ডা। তাপমাত্রা মাইনাস তিন কী চার তো হবেই। তবে হাওয়ার দাপটে মাইনাস দশে নেমে যাওয়ার কথা। কিন্তু শরীরের কাছে সব মাইনাস-ই এক। এদিকে পায়ের নীচে পাথর, সন্তর্পণে পা ফেলতে হয়। নইলে পা মচকানোর সম্ভাবনা। ঘন্টা দুয়েক হাঁটবার পর এক জায়গায় এসে পড়লাম, যেখানে

মনে হল রাস্তাটা দুম করে একটা পাথরের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়েছে। আর সেই দেওয়াল বেয়ে জিগজ্যাগ রাস্তা ওপরে উঠে গেছে। আজ আমাদের গন্তব্য বেস ক্যাম্প। সেই টানেই উঠতে শুরু করলাম। আবার সেই বুকে হাঁপর টানার মত কষ্ট, নাক থেকে জল পড়া, পা আর তুলতে না পারা। অক্সিজেন কম। তবে ক্রমে ব্যাপারটা অভ্যাসে পরিণত হল। মনে মনে ভাবি এই না হলে কি আর ই.বি.সি.-টা ই.বি.সি. হত? সান্দাকফু হয়ে যেত! সবাই দিব্যি গাড়ি করে চলে আসলে মজাটাই নষ্ট। যেটা উত্তর ই.বি.সি.-তে চিন করে ফেলেছে!

আধঘন্টায় খাড়াই পথটুকু পার হয়ে গেলাম। থিয়াংবোচের পর এইখানে শান্তনুর ফোনে নেটওয়ার্ক সিগনাল এল। বাড়িতে ছোট করে খবর জানিয়ে আবার হাঁটা শুরু। বোল্ডারের আকার বেড়েছে। দেখে মনে হয় ক্ষুদ্র টিলাই যেন এক একটি। এরকম ক্ষুদ্র টিলায় ভরা কয়েকটা ছোট পাহাড়ের মতো জায়গা পার করে হঠাৎই চোখের সামনে ফুটে উঠল গোরখশেপের ছোট ঘরগুলো। সময় দেখলাম মোটে ৯.৪৫। অবাক হলাম এটা দেখে যে এখন যেখানে আছি গোরখশেপ তার থেকে অন্তত ৪০-৫০ মি নীচেতে। অদ্ভুত ! তেমন কষ্ট হল না তো। নিজেদের ওপর বিশ্বাস কয়েকগুণ বেড়ে গেল। রমেশ তাড়া লাগাতে শুরু করল। কিন্তু এই জায়গার কিছু ছবি না তুলে এবং বেশ ভাল করে উপভোগ না করে চলে যাওয়াটাও অন্যায়। সামনে ডানদিকে কোনাকুনি নুপৎসে, তার পেছনে উঁকি মারছে এভারেস্ট, তারপর লো-লা, খুম্বুৎসে, দূরে চাংৎসে, সোজা নীচের দিকে ই.বি.সি.-এর ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড এতদূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে। তার পেছনে খুম্বু আইসফল, তার নীচে থেকে টানা বেরিয়ে এসে আমাদের ডানদিক ধরে সোজা লোবুচের দিকে চলে গেছে খুম্বু গ্লেসিয়ার। বাঁদিকে কোনাকুনি পুমোরি, আর পেছনদিকে বেশ দূরে আমাদাবলাম। আহা! চোখ জুড়িয়ে গেল। খুম্বু গ্লেসিয়ারকে এখান থেকে দেখে মনে হয় যেন বরফে সমুদ্রের মত ঢেউ খেলে গেছে অথবা ঢেউ খেলতে খেলতে বয়ে যাওয়া একটা বিরাট নদীকে কেউ যেন এক লহমায় ঠাণ্ডায় জমিয়ে দিয়েছে।

মিনিট দশেকের বিহ্বল ভাব কাটিয়ে বেশ দ্রুতগতিতে গোরখশেপ চলে এলাম। সামনেই বুদ্ধ লজের ঘরে জিনিসপত্র রেখে সবাই গার্লিক স্যুপ খেয়ে নিলাম। এখানে এসে থেকেই শান্তনুর মাথা ধরেছিল - অল্টিচ্যুড সিকনেস। স্যুপ খেয়ে খানিক সুস্থ হল। বাকিরাও চাঙ্গা হলাম। বিশ্রাম নেওয়ার সময় নেই। এগারটার মধ্যে তৈরি হয়ে সামান্য কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম এভারেস্ট বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে। গোরখশেপ থেকে এগোনোর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রকৃতি কেমন যেন ভয়ঙ্কর সুন্দর চেহারা নিতে শুরু করল। চোখ ধাঁধানো রোদ, তার সঙ্গে বরফ ঠাণ্ডা হাওয়া, পায়ের নীচে প্রায় পুরোটাই ঝুরো পাথর। এর ওপর দিয়ে হাঁটা যথেষ্ট কষ্টকর। দ্রুত চলা যায় না, আর পিছলে যাওয়া আটকাতে পা টিপে টিপে চলতে গিয়ে সহজেই ব্যথা করতে শুরু করে।

গাঢ় রোদচশমার ওপর দিয়ে সূর্যের আলো চোখে পড়াতে, সর্ষেফুল দেখার উপক্রম হল। ভাল মাউন্টেনিয়ারিং গগলস্-এর অভাব প্রতি মুহূর্তে বোধ করছি। মাথা নীচু করে যেদিকেই তাকাই ফ্যাকাশে, নয়ত হলদেটে-সাদা বা ধূসর বর্ণের পাথর। চারিদিক রুক্ষ, শুষ্ক অথচ কত কাছেই না পৃথিবীর সেরা মিষ্টি জলের ভাণ্ডার! খুম্বু হিমবাহকে ডানদিকে রেখে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হেঁটে এমন এক জায়গায় এসে পড়লাম যেখান থেকে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড সামনে প্রায় ১০০ মিঃ নীচে গ্লেসিয়ারের ওপর দিয়ে কোনাকুনি ভাবে চলে গেছে খুম্বু আইসফলের প্রান্ত পর্যন্ত। এখান থেকে ই.বি.সি. এবং এভারেস্ট দুটোই এক সরলরেখায় দেখা যায়। তবে এই জায়গাটা ভীষণ অস্থির, ঠিক ভারসাম্য নেই যেন। টুকটাক পাথর এদিক সেদিক থেকে পড়ছে। দাঁড়িয়ে ফটো তোলার অবকাশ নেই। রমেশের কথামত প্রায় একদৌড়ে জায়গাটা পার করে ডানদিকে ঘুরে নীচে নেমে পড়লাম। এবার সোজা বেস ক্যাম্পের দিকে এগোনো। দূরত্ব খুব জোর ১ কিমি হবে। এমনিতে দেখে মনে হয় ২০০-৩০০ মিঃ-এর বেশি নয়। কিন্তু খুম্বু গ্লেসিয়ারের ওপর দিয়ে তো কেউ আর গাড়ি চলার রাস্তা বানায়নি। সুতরাং আরও আধ ঘন্টা মতো হেঁটে পৌঁছে গেলাম।

পৌঁছতেই প্রথমে স্বাগত জানাল একটা গ্রেট রোজফিঞ্চ পাখি। আমাদের দেখে বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে নিজের মত ঘোরাঘুরি করল। যেন তোয়াক্কাই করল না। আর সত্যি বলতে কি, ভয় পাওয়া দূরে থাক - নিজে থেকেই কাছে এসে পোজ্ দিল যেন। এ অভাবনীয় উপহার আর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারার জন্য হিমালয়কে করজোড়ে প্রণাম।

কালাপাথর টপ থেকে খুম্বু আইসফল এলাকা

ই.বি.সি. এভারেস্টের ঠিক কোলে নয়। এভারেস্টের কোলে আছে লো-লা এবং তার কোলে বেস ক্যাম্প। ফলে এখান থেকে এভারেস্টের চূড়া দেখা যায় না, শুধু ওয়েস্ট সোলডারের খানিক দেখা যায় আর বাকি সবই নুপৎসে তে ঢাকা পড়ে যায়। এভারেস্ট বেস ক্যাম্প লেখা ব্যানার আর প্রচুর প্রেয়ার ফ্ল্যাগ জড়ানো একটা জায়গায় আমরা নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছনোর প্রমাণস্বরূপ কিছু ছবি তুললাম। শুনেছি এপ্রিল-মে মাসে গরমকালে ২৮০০০ ফিটের ওপরে তাপমাত্রা থাকে -৩৫ ডিগ্রী। এই নভেম্বর মাসে কত হবে কে জানে! চূড়োর দিকটায় তাকালে ধোঁয়ার মত দেখাচ্ছে। বরফের ঝড় বইছে বোধহয়। মিনিট কুড়ি-পঁচিশ ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড-এ সময় কাটিয়ে মন ভরিয়ে ছবি তোলার পর ফেরার পথ ধরলাম।

গ্লেসিয়ার থেকে বেরিয়ে প্রধান রাস্তায় ফিরতে গিয়ে মনে হল পাথর সব আলগা। আসার সময় দৌড়ে পেরিয়েছিলাম। তবে তখন লোকজন কিছু বেশি ছিল। হঠাৎ আমরা এখন একা হয়ে পড়েছি। রমেশ চলেছে সবার আগে, তার দুহাত পেছনেই দিব্যি লাফাতে লাফাতে দুর্গা, তার পেছনে কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে আমি, আমার থেকে সাত-আট হাত পেছনে শান্তনু। হাওয়ার দাপট বেড়েছে। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে টুকটাক করে পাথর পড়ছে। এগিয়ে গিয়ে যখন রিজটার নীচে পৌঁছেছি তখন এক কাণ্ড হল। হঠাৎ কড়মড় করে আওয়াজ, থতমত খেয়ে কী হচ্ছে বোঝার আগেই দেখি রমেশ আর দুর্গা "ভাগো" বলে বিদ্যুৎ বেগে আমার দিকে দৌড়ে এলো এবং আমাদের দুজনকে পেরিয়ে গিয়ে একটা বড় পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিল। ততক্ষণে পাথর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমরাও মারলাম পেছনে দৌড়। যেসব আকারের পাথর পড়ছে তাতে গায়ে পড়লে মৃত্যু অস্বাভাবিক নয়, নাহলে অন্তত অঙ্গহানি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। সুতরাং কিছুক্ষণ আগেই যে পাথর ডিঙ্গিয়ে এগোনো দুষ্কর মনে হচ্ছিল, সেগুলোকেই এখন দুদ্দারিয়ে দৌড়ে পেরোলাম। প্রাণভয়ে দৌড়লে যে মানুষের ক্ষমতা বাড়ে তার প্রমাণ। অবশ্য পা মচ্‌কাতেও পারত, হাই অ্যাঙ্কেল জুতো তার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আমরা অক্ষত অবস্থায় একখানি বিরাট পাথরের আড়ালে রকফল থামার অপেক্ষায় রইলাম তিন-চার মিনিট। পাথর পড়া বন্ধ হলে প্রায় দৌড়ে রকফল অঞ্চল পার হলাম। বুক যেন ফেটে যাচ্ছে, ক্রমাগত হাপর টানার মত ব্যাপার। সমুদ্রতল থেকে ৫৩০০ মিঃ ওপরে দৌড়োনো যে মুখের কথা নয়! ফুসফুসের ক্ষমতার চূড়ান্ত পরীক্ষা! ফেরার পথে আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি, শুধু স্বপ্ন আর লক্ষ্যপূরণের আনন্দের এক অদ্ভুত অনুভূতি সারা শরীর ও মন জুড়ে রইল। স্মারক হিসাবে সঙ্গী করে নিয়ে এলাম একখন্ড ছোট নুড়ি - যা বহুকাল পূর্বে টেথিস সাগরের বুক থেকে উঠে এসে হিমালয়ের এই সর্বোচ্চ অঞ্চলে বিরাজ করেছে।

লজে ফিরে তিনটে নাগাদ লাঞ্চ সারলাম। শান্তনু আর আমি ঠিক করলাম কালাপাথরের দিকে যতটা পারি এগোব। রমেশ সম্মতি জানাতে আর আবহাওয়া ভালো থাকায় এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। পথ হারানোর ভয় নেই। যারা ওপরে উঠেছিল তারা ফিরছে। এখন ওপরে ওঠবার কেউ নেই। দেখতে ঢালু হলেও উঠতে গিয়ে বুঝলাম বেশ খাড়া। তাছাড়া ৪৫ ডিগ্রী কোণটা নেহাত কম নয়, ঝুরো পাথর আর নুড়ির জন্য বেশ সময় লাগছে। একটু পিছলে গেলে সামাল দেবার মত বিশেষ কিছু নেই। বেশ পরিশ্রমসাপেক্ষ। হাঁফাতে হাঁফাতে বুঝলাম শরীর বেশিক্ষণ চলবে না। রাস্তায় প্রথম যে স্যাডল্ পেলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলাম, তাও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ওঠার পর। কালাপাথর যে কতদূর তা বোঝার কোন উপায় দেখলাম না। ছদ্মচূড়া দেখে ভুল হয়। সামনে যাকে উঁচু চূড়ো বলে মনে হচ্ছে তার মাথায় পৌঁছলে দেখা যায় ওপরে আরেকটা তেমনই চূড়া। এবং এরকম চলতেই থাকে। সুতরাং খানিক বাদে আমরা ঠিক করলাম আর বেশি না এগিয়ে একটু চওড়া যে জায়গাটায় অপেক্ষা করা যাবে সেখান পর্যন্তই এগোব। দেখে শুনে পছন্দ করলাম সেরকম একফালি জায়গা যেখানে এভারেস্ট পিরামিড নুপৎসের পাশে ভালভাবে দৃশ্যমান। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা মুখে এসে পড়ছে আর ভেতর পর্যন্ত কেঁপে

উঠছে।

এভারেস্ট শিখরে গোধূলির আভা

এখানে বসে থাকার সিদ্ধান্তে আমরা যে কোনো ভুল করিনি তা মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেল। অস্তাগত সূর্যের ছটা এভারেস্ট আর নুপৎসের রঙ মিনিটে মিনিটে পালটে দিচ্ছে। চারপাশে পুমোরি, লো-লা বা ম্যালোরি গ্যাপ, তাওচে, খুম্বুৎসে, লিন্ট্রেন - কাকে ছেড়ে কাকে দেখব! কিন্তু মন টানছে এভারেস্ট-ই। সুর্যের শেষ রশ্মি এভারেস্ট এর ওপরেই পড়ছে, তা সে যতই এখান থেকে নুপৎসে কে উঁচু দেখাক! এত রঙের সম্ভার আগে কখনো কোন পর্বতচূড়ায় দেখিনি। আমরা অভিভূত হয়ে শুধু দেখে চলেছি এ মায়াবী রঙের খেলা। মাঝে মধ্যে বোধহয় ভুল করেই ক্যামেরার শাটার টিপেছি। সাদা থেকে স্বর্ণাভ হলুদ, তারপর তা থেকে উজ্জ্বল কমলা, তারপর লাল গনগনে আগুন। লাভা উদ্গীরণ হবে যেন! সূর্যাস্তের পরেও রঙের খেলা শেষ হল না। লালবর্ণ আসতে আসতে হাল্কা হতে হতে কেমন নীলচে বেগুনীতে পরিণত হল। কিছু পরেই পাংশুটে ধূসর হয়ে আবছা আলো মেখে রইল সে। প্রকৃতির এই ছবি আঁকা দেখেত দেখতে বিভোর হয়ে পড়েছিলাম। সম্বিৎ ফিরতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বেশ দেরি হয়ে গেছে। পাঁচটা কুড়ি। ঠাণ্ডা জাঁকিয়ে গায়ে কেটে বসছে। সন্ধ্যে হতে না হতেই তাপমাত্রা শূন্যের কত নীচে চলে গেছে তা কে জানে! ডাউন জ্যাকেটের প্রয়োজন। কিন্তু আমরা শুধু কয়েকটা মোটা আস্তরণ আর উইন্ডস্টপারের ভরসায়! সঙ্গে টর্চও আছে একটাই। ৪৫ ডিগ্রি কোণে দ্রুত নামা যায় না, তাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামার চেষ্টা করলাম। বোধহয় মিনিট পঁচিশেক লেগেছে, কিন্তু তারমধ্যেই দাঁতে দাঁত লেগে যাবার যোগাড় হয়েছিল। আস্তানায় ফিরে একবাটি করে গরম গার্লিক স্যুপ খেয়ে চাঙ্গা হলাম।

এখানকার হোটেল নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের সমাহার। বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঠাণ্ডায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে গা গরমের আশায় গোল হয়ে গল্পগুজব করছে। শান্তনু আজ ভীষণ ক্লান্ত। কথা বলতে বলতে তার ঢুলুনি এসে যাচ্ছে। কোনরকমে তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সাঙ্গ করে ঘরে গেলাম শুতে। এখানকার কম্বলের দশা দেখে ভরসা করতে পারছিলাম না। ঠাণ্ডা সাংঘাতিক, কম্বল ফিনফিনে। কিন্তু কম্বলগুলোকে বৃথাই তাচ্ছিল্য করেছিলাম! মারাত্মক উপযোগী জিনিস। কী দিয়ে তৈরি জিজ্ঞাসা করেছিলাম পরের দিন, ওরা বলেওছিল কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি সেটা কী বস্তু। সে রাতেই আরও একটা ব্যাপার হয়েছিল - আমরা দুজনেই হ্যালুসিনেট করেছিলাম আর উদ্ভট সব স্বপ্ন দেখেছি, সকালে উঠে বুঝেছি ভাল ঘুম হয়নি। এর কারণ অবশ্য বোঝাই যায় - উচ্চতা, কম বায়ুচাপ আর অক্সিজেনের অভাব। একসময় তো দমবন্ধ হওয়ায়, ঘরের একটা জানলা অল্প ফাঁক করে দিয়েছিলাম। দেখলাম মাথার দিকের কাঁচের জানলায় তখন নুপৎসে চাঁদের আলো মেখে দাঁড়িয়ে আছে।

নভেম্বর ১১ - কালাপাথর টপ

ভোররাতে উঠে জানলার দুদিকে বরফ জমে থাকতে দেখলাম। আজকের দিনটা শুরু করার কথা ছিল ভোর চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে। কিন্তু রাতে ভাল ঘুম না হওয়ায় আর বাইরের ঠাণ্ডার ধাক্কায় বেরোতে বেরোতে প্রায় পাঁচটা বেজে গেলো। বাইরে তাপমাত্রা মাইনাস বারো থেকে পনেরোর মধ্যে তো হবেই। সঙ্গে মৃদুমন্দ হাওয়া। তবে সে হাওয়াই ঠকঠকানি ধরানোর জন্য যথেষ্ট। কালাপাথরের পথ এই ঠাণ্ডার জন্য একেবারে যুতসই। যতই ঠাণ্ডা থাক, একবার চড়াই উঠতে শুরু করলে পনেরো মিনিটের মধ্যেই শরীর গরম হয়ে যাবে। আজ অবশ্য জ্যাকেট পরেই হাঁটছি, হাওয়ার দাপটে খোলবার সাহস হয়নি। অন্ধকার থাকতেই মন্থরগতিতে উঠছি। কাল বিকেলে যেখানে এসেছিলাম, ততটা আসতেই আলো ফুটে গেল। ধীরে ধীরে আকাশে আলো বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সব শৃঙ্গের রঙ বদলাতে শুরু করল।

৫৫৫০ মিঃ এর কাছে পথ চলতে বেশ কষ্ট। প্রচুর জোর দরকার পড়ছে। রমেশ বার বার তাড়া দিচ্ছে। যত বেলা বাড়বে তত হাওয়া বাড়বে। আরেকটা সমস্যা আছে। কালাপাথর এভারেস্টের ঠিক পশ্চিমে, একটু দক্ষিণ কোনাকুনি।তাই কালকে সন্ধ্যায় অস্তমান সূর্যের আলো এভারেস্টের চুড়োয় পড়তে দেখেছি। কিন্তু সেই অবস্থানই আজ সমস্যার কারণ হতে পারে। সূর্যোদয় হবে এভারেস্টের পেছন দিক থেকে। সে সময়ের আগে না পৌঁছলে ভালভাবে দেখা বা ছবি তোলা কোনটাই হবে না। চোখে সরাসরি সূর্যের আলো এসে পড়বে। সুতরাং পা চালাও। কিন্তু গতির ব্যাপারে নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে চলাই ভাল। সকাল প্রায় আটটা নাগাদ তিন ঘন্টার পরিশ্রম শেষে উঠে এলাম কালাপাথরের শীর্ষে। এখানে রয়েছে এভারেস্টের ওয়েদার রিপোর্ট দেওয়ার যন্ত্রপাতি, টাওয়ার, সামিট এক্সপেডিশনে অভিযাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার আরও অনেক যন্ত্র। ছোটখাটো মোবাইল টাওয়ার। গোরখশেপ থেকে এই পথটুকুতে তাই নেটওয়ার্ক রয়েছে পুরোমাত্রায়। চূড়োর ওপর এত কিছু থাকার দরুণ মানুষ দাঁড়ানোর জায়গার অভাব।

কালাপাথরের অবস্থান মাউন্ট পুমোরির দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরা বা রিজ্-এর ওপর। এই গিরিশিরাটি সটান পুমোরি থেকে নেমে স্থূলকোণ করে উঠে এসে এই কালাপাথর টপ তৈরি করেছে। আর তারপর ঢাল বেয়ে নেমে গেছে গোরখশেপ পর্যন্ত। সেজন্য এই একদিক থেকেই এখানে ওঠা যায়। অপর দিকে খাড়া খাদ। সেদিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। এই চূড়ার কাছাকাছি ছোট পাথরও নেই। শুধু বড় বড় কালচে বোল্ডার। ভাল করে নজর করলে দেখা যায়, পাথরের গায়ে একরকম শৈবাল জন্মায়। সেগুলি তীব্র রোদ আর অতিবেগুনি রশ্মিতে পুড়ে স্রেফ কালো ছোপে পরিণত হয়েছে। সেজন্যেই এই জায়গার এই নাম। এর ওপর দিয়ে চলা বেশ ঝকমারি। প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে পাথর ডিঙোতে হয়। দুটো বোল্ডারের মাঝে একটা পা ঢুকে গেলেই চিত্তির। তখন হেলিকপ্টার রেসকিউ করতে হবে। সূর্যোদয়ের অনেক পরে আমরা পৌঁছেছি। সূর্যের চোখ ধাঁধানো আলো এভারেস্ট আর নুপৎসের মাঝখান দিয়ে এসে পড়ছে কালাপাথরের মাথায়। বাস্তবিকই, কালাপাথর কেন এত বিখ্যাত সেটা এর ওপরে উঠে আসাতে একদম পরিস্কার। এভারেস্টকে এত বড় করে, এত পরিস্কার ভাবে ধরণীর আর কোন বিন্দু থেকে দেখা যায় না। এখান থেকে মাউন্ট পুমোরিকে হাতের টোকায় ছোঁয়া যাবে বলে মনে হয়। অনেকদূর অবধি খুম্বু হিমবাহের বিস্তার চোখে পড়ে। তীব্র নীলাভ আকাশের বুকে এতগুলি শ্বেতশুভ্র বিরাটকায় পর্বতশৃঙ্গ আর তাদের মধ্যমণি এভারেস্ট - সব মিলিয়ে এ এক অসামান্য অনুভূতি। আমাদের ট্রেকের সবচেয়ে উত্তেজনাময় মুহূর্ত এটাই। এবার ফেরার পালা।

হেমন্তের এভারেস্ট বেসক্যাম্প

~ তথ্য- এভারেস্ট বেসক্যাম্প ট্রেক ~ || ~ এভারেস্ট বেসক্যাম্প ট্রেকিং-এর আরও ছবি ~ || ~ এভারেস্ট বেসক্যাম্প ট্রেক রুট ম্যাপ ~

শিবপুর বি-ই কলেজের প্রাক্তনী সিভিল ইঞ্জিনীয়ার শুভজিত চৌধুরী, বর্তমানে বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। প্রধান শখ পাহাড়ে বেড়ানোর পাশাপাশি পাখি দেখার নেশা।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

আমার দেখা চিন

শ্যামলেন্দুবিকাশ সরকার

~ চিনের আরও ছবি ~

সেপ্টেম্বরের একরাতে স্ত্রী অনুসহ আমরা ক'জন কলকাতা থেকে বিমানে চেপে আড়াই ঘন্টায় পৌঁছলাম চিনের ইউনান প্রদেশের কুনমিংয়ে। ঘড়িতে স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে পাঁচটা। পর্যটন ও ফুল রপ্তানীর সুবাদে কুনমিং চিনের অন্যতম শহর। তিনতলা বিশাল ঝকঝকে বিমানবন্দর। ছবির মতো সাজানো দোকানপাট। প্রচুর বিমান দাঁড়ানো দেখে বিমানবন্দরের ব্যস্ততা বোঝা যায়। অভিবাসন পর্ব সেরে বেরিয়েই গাইড টিনার সঙ্গে দেখা। চিনা গাইডরা নিজেদের খটমট নামের পরিবর্তে বিদেশি পর্যটকদের জন্য সহজ নামে পরিচয় দেয় - টিনা আমাদের গাইডের এমনই পরিবর্তিত সহজ নাম। চলনসই গোছের ইংরেজিতে সে শুভেচ্ছা বিনিময় করল সবার সঙ্গে। পাশের কাউন্টারে কিছু ডলার ভাঙিয়ে চিনা মুদ্রা ইউয়ান সংগ্রহ করলাম। বাতানুকূল বাস অপেক্ষা করছিল বাইরে। আমরা উঠতেই মসৃণ প্রশস্ত পুষ্পশোভিত পথে এগিয়ে চলল বাস। পথে ম্যাকডোনাল্ডসে বিরতি প্রাতরাশের জন্য। বেলা বারোটার আগে হোটেলে চেক-ইন হবেনা, তাই বাস সরাসরি পৌঁছল প্রকৃতির বিস্ময় স্টোন ফরেস্টে। টিকিট কেটে ব্যাটারি চালিত দু-কোচের গাড়ি চেপে চললাম ইউনেস্কোর ঐতিহ্য তালিকাভুক্ত স্টোন ফরেস্টের অভ্যন্তরে। গাড়ি চলছে ধীরগতিতে, মাঝেমধ্যে বিরতিসহ। ফরেস্টের গাইড বা গাড়িচালক অধিকাংশই মহিলা। প্রায় সকলের মাথায় মুকুটের মত টুপি যার দুপাশে দুটো শিং রয়েছে। এই শিং নিয়ে এক মজার (!) গল্প শোনাল গাইড। কয়েক দশক আগেও কোনো পুরুষ কোনো কুমারী চালিকার শিং স্পর্শ করলে প্রথানুসারে পুরুষটি চালিকাকে বিয়ে করতে বাধ্য হত। আজ পুরনো প্রথা উঠে গেলেও সাজগোজের অঙ্গ হিসাবে শিং রয়ে গেছে। স্টোন ফরেস্টে সার দিয়ে দাঁড়ানো পাথরগুলো কয়েক লক্ষ বছরের পুরনো। দীর্ঘকাল ধরে ঝড়-জলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে চুনাপাথরের একাধিক টিলা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে নানা আকৃতি ধারণ করেছে। দণ্ডায়মান পাথরগুলির কিছু উল্লম্বভাবে, কিছু অনুভূমিকভাবে বহু খণ্ডে বিভক্ত। এর মধ্যে কোনো কোনো প্রস্তরসজ্জার উপরিভাগ মানুষ, হাতি, ভালুক ইত্যাদির দেহাংশ বলে মনে হয়। কোনোটাকে মনে হয় উদ্ভিদের ফসিল। কিছু পাথরখণ্ডের ভারসাম্য অবাক করার মত। প্রচুর গাছপালা রয়েছে গোটা এলাকা জুড়ে। ফরেস্টের অভ্যন্তরে একটা সুন্দর সরোবর দেখে শেষপর্বে কিছুটা পায়ে হেঁটে ঘুরলাম। প্রকৃতির হাতে তৈরি কিছু গুহা, তোরণ চোখে পড়ল হাঁটাপথে। ঘন্টাদুয়েকে কয়েকশো বর্গকিলোমিটার জুড়ে প্রকৃতিসৃষ্ট পাথরের উদ্যান দেখে চললাম স্থানীয় ফুলের বাজারে।

ফুলের নৌকা, কুনমিং পুষ্প প্রদর্শনী উদ্যান

কুনমিংয়ের জগদ্বিখ্যাত ফুলের বাজার দেখে তাক লেগে যায়। বিশাল বিশাল বাজারে ছোটো-বড় অসংখ্য ফুলের দোকানে থরে থরে সাজানো কতধরণের ও কতরকমের যে ফুলের সজ্জা, তা দেখে শেষ করা যায় না। রংবেরংয়ের টাটকা ও শুকনো ফুলের বাহারও দেখার মত। ফুলের বীজ, চারা সবই পাওয়া যাচ্ছে বাজারে। চিনের ফুল রপ্তানির ৭০ শতাংশ কুনমিংয়ের দখলে। পুব থেকে পশ্চিম - পৃথিবীর সর্বত্র কুনমিংয়ের ফুলের সমাদর রয়েছে। এখানকার পথে-ঘাটে, দোকান-বাজারে সর্বত্র ফুলের প্রাচুর্য এর সত্যতা প্রমাণ করে।

বিকেলের গন্তব্য কুনমিংয়ের আরেক দ্রষ্টব্য বিশ্ব কৃষি-পুষ্প প্রদর্শনী উদ্যান। টিনার সাহায্যে ট্যাক্সি ধরে ১৬ ইউয়ানের বিনিময়ে পৌঁছে গেলাম উদ্যানে। ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দে এখানে বিশ্ব কৃষি- পুষ্প মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাগানে আড়াই হাজারের বেশি প্রজাতির ২০ লক্ষাধিক ফুলের চারা, ফুল-ফলের গাছ ও অন্য নানা ধরনের গাছ রয়েছে যার ১১২টি বিরল প্রজাতির। ১০০ ইউয়ানের টিকিট কেটে প্রবেশ করতেই অভ্যর্থনা জানাল ফুলে ভরা এক সুবিশাল সাইকা বৃক্ষ। হাজার হাজার পুষ্প চারা সাজিয়ে গড়া কয়েক মিটার ব্যাসের সচল পুষ্প ঘড়িটি বাগানের এক আকর্ষণ। লক্ষ লক্ষ পুষ্প চারা দিয়ে তৈরি একাধিক কেয়ারী রয়েছে বিশাল এলাকা জুড়ে। চিন তথা বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার বৃক্ষ প্রদর্শনের জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক অঞ্চল। গ্রীনহাউসে চোখধাঁধানো কয়েকশো প্রজাতির পাতাবাহার, ক্যাকটাস আর অর্কিড ছাড়াও রয়েছে প্রদর্শনীকক্ষ। বাগানের নানাস্থানে বেঞ্চিতে বিশ্রাম বা গল্পে রত অনেকে। একপ্রান্তে লেকের কাছাকাছি ড্রাগনাকৃতি গাছ আর সবজি বিভাগে অদ্ভুত ও বিশাল আকৃতির লাউ-কুমড়োও নজর কাড়ে দর্শকের।

বাগান থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরতে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হল। হোটেলের ইংরেজি কার্ড কোনো চালক পড়তে পারছেনা আর চালক যা বলছে আমার মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পনের মিনিটে সাতটা ট্যাক্সি এল আর চলে গেল, ক্রমশঃ অধীর হয়ে পড়ছি। এমন সময়ে বিপদতারণ হয়ে দেখা দিলেন এক প্রবাসী ভারতীয়। ১০ বছর কুনমিংবাসী মিশ্রজি হোটেলের কার্ড পড়ে এক ট্যাক্সিচালককে ডেকে বুঝিয়ে বলায় সে আমাদের নিয়ে চলল হোটেল অভিমুখে। তবে বিভ্রাটের এখানেই শেষ নয়। রাস্তা জ্যাম থাকায় ঘুরপথে চলল ট্যাক্সি। প্রায় দ্বিগুণ পথ পেরিয়ে পৌঁছলাম হোটেলে। এবার ভাড়া নিয়ে বিভ্রান্তি। চালকের কথা আমি বুঝিনা, আমার কথা চালক বোঝেনা। পাঁচ-সাত মিনিট পর ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ঢুকলাম হোটেলে। ভাগ্যক্রমে টিনা তখন রিসেপশনে বসেছিল। তাকে ডেকে নিয়ে বাইরে ট্যাক্সির কাছে হাজির হলাম। টিনার মধ্যস্থতায় ভাড়া মিটিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ইংরেজি-অচল চিনে বহিরাগতদের কী বিড়ম্বনা হতে পারে, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম সেদিন!

সাংহাই-এর পথে

পরদিন সকাল আটটায় বিমানে চেপে কুনমিং ছাড়লাম। এগারটায় সুবিশাল ঝকঝকে সাংহাই বিমানবন্দরে পৌঁছে স্থানীয় গাইড জুডির সঙ্গে সরাসরি হোটেলে চেক-ইন। দুপুরে ভারতীয় রেস্তোরাঁয় ভালই খেলাম। খাওয়ার পর ঘন্টা দুয়েক ধরে চলল স্থানীয় বাজারে কেনাকাটা পর্ব। বিকেলে হুয়াংপো নদীর পাড়ে পৌঁছে দেখি দেশবিদেশের প্রচুর মানুষ বায়ুসেবনে রত। কিছুক্ষণ তাদের পাশাপাশি পায়চারি করার ফাঁকে রাতের ক্রুজের টিকিট কেনা হল। আটটা থেকে ন'টা তিনতলা লঞ্চে চেপে রাতের সাংহাই দেখব আমরা। সার দিয়ে লঞ্চ জেটি। নয় নম্বর জেটি থেকে লঞ্চে উঠে দুপাড়ে চোখ ফেরালাম। দুদিকেই গগনচুম্বী অট্টালিকা, হোটেল, শপিং মল - সবই আলোকোদ্ভাসিত। আলাদাভাবে নজর কাড়ছিল ৪৬৮ মিটার উঁচু ওরিয়েন্টাল পার্ল টিভি টাওয়ার আর ৪২০ মিটার উঁচু জিনমাও টাওয়ার। নদীর দুপাশে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে, বসে উপভোগ করছিল শহরের আলোকসজ্জা ও চলমান সুসজ্জিত লঞ্চের আরোহীদের উচ্ছ্বাস। বৈভবের ছটায় ভরা লক্ষ লক্ষ ওয়াটের আলো শুধু সাংহাইয়ের নয়, গোটা চিনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিজ্ঞাপন। ক্রুজ সেরে ভারতীয় রেস্তোরাঁয় সুন্দর নৈশাহারের পর ফিরলাম হোটেলে।

বাগান ভিলা, সুঝৌ

সকালে হোটেলের জানালা দিয়ে চাইতে হুয়াংপো নদীর ওপর চওড়া সুফি সেতু চোখে পড়ল। সাতসকালে তার ওপর দিয়ে চলেছে হাজার হাজার গাড়ি। সাংহাইয়ের জনসংখ্যা এক কোটি সত্তর লক্ষ। বাস, ট্যাক্সি, মেট্রোরেল আর সাইকেল মুখ্য যানবাহন। সাড়ে আটটায় চললাম ৯০ কিলোমিটার দূরের উদ্যাননগরী সুঝৌ। পথের দুপাশে নতুন বসতি, চাষের জমি আর অনেক ছোটোবড় কারখানা। নির্মীয়মান বহুতল আর কারখানার সংখ্যাও কম নয়। তিনতলা-চারতলা রাস্তাও চোখে পড়ল কয়েক জায়গায়। চিনে ইংরেজির চলন না থাকায় ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরেজিতে এলাকার বর্ণনা দিচ্ছিল জুডি। সুবিশাল চিনদেশে বহু ভাষা চালু থাকলেও ম্যান্ডারিন এদেশের প্রধান ভাষা। দশটায় পৌঁছলাম পুরনো নগরী সুঝৌ। বেশকিছু প্রাচীন সুসজ্জিত বাগানবাড়ি রয়েছে এখানে। তার মধ্যে লায়ন গ্রোভ এবং মাস্টার অব নেটস - এই দুটো দেখলাম আমরা। কয়েক একরজোড়া বাগানবাড়িগুলোয় নকশাদার কাঠের বাড়িঘর, বাগান আর ছোট জলাশয় রয়েছে। অলঙ্কৃত কাঠের ঘরের পুরনো আসবাব ছাড়াও বাগানের কিছু মূর্তি, কৃত্রিম পাহাড়, জলাশয়ের শালুক ও রঙিন মাছ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেখা সেরে পশ্চিমি রেস্তোরাঁয় আহার করে বাসে চাপলাম।

সুঝৌ দেখে সাংহাই ফেরার পথে সিল্ক কারখানা পড়ল। সেখানে গুটি থেকে রেশম ও বস্ত্র তৈরির খুঁটিনাটি দেখাল কারখানার কর্মীরা। সামনের কাউন্টারে বিক্রি হচ্ছিল সিল্কের থান, চাদর, লেপ ও আরো অনেক কিছু। তবে লেপের ন্যূণতম দাম ১৫,০০০ টাকা শুনে কেবল দেখার আনন্দটুকু পাথেয় করে ফিরতে হল।

সাংহাই ফিরে সোজা উঠলাম লংইয়াংলু মেট্রো স্টেশনের ওপরে। এখান থেকে পুডং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ম্যাগলেভ (ম্যাগনেটিক এলিভেটেড) ট্রেন যায় যার সর্বাধিক গতি ঘন্টায় ৪৩০ কিলোমিটার। দুপুরে এটি সর্বোচ্চ গতিতে চললেও অন্যসময় এটির গতিবেগ ৩০০ কিলোমিটারের আশেপাশে রাখা হয়। পাঁচ মিনিটেই ট্রেন ঢুকল প্ল্যাটফর্মে। ট্রেনে দুটি ভিআইপি আর চারটি ইকনমি কোচ। ফিরতি টিকিট আগেই কাটা ছিল, ট্রেনের স্বয়ংক্রিয় দরজা খুলতে চেপে বসলাম ইকনমি কোচে। কোচের অর্ধেক সিট খালি। গোটা ট্রেনটা বাতানুকূল করা। ভিআইপি কোচে মাত্র দুজনকে উঠতে দেখলাম। কয়েক মিনিটেই ট্রেন ছাড়ল। কামরার সিলিংয়ের নীচে ডিসপ্লে বোর্ড গাড়ির গতি দেখাচ্ছে। দুমিনিটের মাথায় গাড়ির সর্বোচ্চ গতি দাঁড়াল ঘন্টায় ৩০১ কিলোমিটার। এই দুরন্ত গতিতেও কোনো ঝাঁকুনি নেই, চোখ বন্ধ করলে বোঝার উপায় নেই ট্রেন চলছে। প্রচণ্ড চৌম্বকশক্তি গোটা ট্রেনটিকে লাইন থেকে সামান্য উঁচুতে রেখে কার্যত উড়িয়ে নিয়ে যায়, তাই এর গতি এত মসৃণ। দুপাশে বসতি, ক্ষেত, কলকারখানা পেরিয়ে ৩০ কিলোমিটার দূরের পুডং পৌঁছলাম মাত্র সাত মিনিটে। প্ল্যাটফর্মে মিনিট তিন-চার ঘুরে ওই ট্রেনেই ফিরলাম লংইয়াংলু। আটটায় নৈশাহার পর্বশেষে ন'টায় বাস পৌঁছে দিল হোটেলে। এখানকার অ্যাকোয়ারিয়ামটি জগদ্বিখ্যাত, ভেবেছিলাম সফরসূচীর ফাঁকে সময় বের করে ওটি দেখে নেব। গাইড জানাল সেটা মোটেই সম্ভব নয়, অগত্যা সে আশা ত্যাগ করতে হল।

পরদিন সকালে চললাম জেড বুদ্ধের মঠ দেখতে। ভিড়ে ঠাসা নানজিং রোড দিয়ে বাস চলেছে। এটি সাংহাইয়ের অন্যতম বাজার এলাকা, বিত্তবান পর্যটকেরা বেশিরভাগ এখানেই থাকে। তবে যাবার পথে হাইওয়ের দুধারে বহুতলের পাশাপাশি বৈপরীত্যের নিদর্শনস্বরূপ প্রচুর টালির বাড়ি চোখে পড়ল। আধঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম মঠে। পতাকা, থাঙ্কা দিয়ে সাজানো মঠে ভিন্ন ভঙ্গিমার দুটি অপূর্ব সুন্দর জেড পাথরের বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। ফুলফল আর অন্যান্য গাছে ভরা বাগান রয়েছে মঠ ঘিরে। বাগানের মূল আকর্ষণ অবশ্য বেশকিছু সুপরিকল্পিত বনসাই যা দেখে তাক লেগে যায়।

রাতের সাংহাই

এদিনের দ্বিপ্রাহরিক আহার ভারতীয় রেস্তোরাঁ শিবা-য়। চিনে অধিকাংশ ভারতীয় রেস্তোরাঁর রান্না ভারতীয় ঘরানার আর বেশ সুস্বাদু। সেখানে ভারতীয় পোষাকপরা চিনা ছেলেমেয়েদের সাথে দুচারজন ভারতীয় কর্মীও রয়েছে। এগুলির অধিকাংশেরই মালিক প্রবাসী উত্তর বা পশ্চিম ভারতীয়রা।

আহারান্তে প্যাকেটজাত নৈশাহার নিয়ে পৌঁছলাম সাংহাই রেলস্টেশন, গন্তব্য শিআন। সুন্দর, সুবিশাল স্টেশনে তিনটি প্রবেশপথ চোখে পড়ল। মেটাল ডিটেক্টর পেরিয়ে যাবতীয় লাগেজ স্ক্যান মেশিনে দেওয়া হল। প্রতি গেটে পাঁচটি করে স্ক্যান মেশিন রয়েছে। স্টেশনের ভিতরে নিরাপত্তাকর্মীরা সদাসতর্ক। পরীক্ষাপর্ব মিটিয়ে চললাম ৯/১০ নম্বর লাউঞ্জের উদ্দেশ্যে যার লাগোয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে আমাদের ট্রেন ১৫টা ৫৩য় ছাড়বে। সেখানে পৌঁছে দেখি গিজগিজ করছে লোক, তবে বসার জায়গাও রয়েছে প্রচুর। খাদ্য-পানীয় আর মনোহারি দ্রব্যের কিছু দোকান রয়েছে লাউঞ্জে। একটু পরে আমাদের টি-১৩৮ নম্বর ট্রেনের খবর হল। ডিসপ্লে বোর্ডে চিনা ভাষার মাঝে মাঝে ইংরেজিতে ট্রেনের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। প্ল্যাটফর্মের গেট খুলবে ট্রেন ছাড়ার আধঘন্টা আগে। সঠিক সময়ে গেট খুলতেই টিকিট দেখিয়ে প্ল্যাটফর্মে পা রাখলাম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে সামনেই আমাদের ৬ নম্বর কোচ। প্ল্যাটফর্ম ও ট্রেনের মধ্যে সংযোগকারী স্টিলের পাত বেয়ে ট্রেনে পা রাখলাম। কোচে বাইশটি ক্যুপেতে তিনটি করে মোট ছেষট্টিটি বার্থ রয়েছে। সাইড বার্থ নেই, বদলে প্রতি ক্যুপের সামনে জানালা ঘেঁষে দুটি করে ফোল্ডিং সিট রয়েছে বহির্দৃশ্য উপভোগের জন্য। ট্রেন ছাড়তেই অ্যাটেন্ডেন্ট দরজা লক করে দিল। পরবর্তী স্টেশনগুলিতে সেই প্রয়োজনমত দরজা খুলবে বা বন্ধ করবে। ষোল ঘন্টার পথ। জানালায় চোখ রেখে দেখছি মাঠ, গ্রাম, নগর কলকারখানা পেরিয়ে চলেছি একে একে। সন্ধ্যায় শুনলাম রাত দশটায় আলো নিভিয়ে দেওয়া হবে। তাই ন'টার মধ্যে খাওয়া সেরে নিলাম। আলো নিভতে শুয়ে পড়লাম বটে, তবে নীচের বার্থে চন্দনদার নাক ডাকায় নিদ্রাদেবী এলেন অনেক দেরিতে।

ঘুম ভাঙতে মুখ ধুয়ে ট্রেনের গরম জলে চা তৈরি করে খেলাম। একটু পরেই হকারের আনাগোনা শুরু হল। ইউনিফর্ম পরা হকারের পণ্যতালিকায় মনোহারী দ্রব্য, খাবার, খেলনা ছাড়াও অনেক কিছু রয়েছে। মাঝেমাঝে রেলের সাফাইকর্মী মেঝে ঝাঁট দিয়ে যাচ্ছে। মাঝরাতে এরকমই এক কর্মী গ্লাভস পরে আমাদের জুতোগুলো গুছিয়ে রাখছিল। অনুর সেই সময় আচমকা ঘুম ভেঙে যায়। ও আমাকে সাবধানে জাগিয়ে লোকটিকে জুতোচোর ভেবে নীচের দিকে ইশারা করে। আমি নিঃশব্দে নীচে তাকিয়ে থাকি। লোকটি সবার জুতো গুছিয়ে দরজা টেনে দিয়ে চলে যাওয়ার পর আমরা আর হাসি চাপতে পারিনি। ঘন্টা দেড়েক লেট করে সাড়ে ন'টায় ট্রেন পৌঁছল শিআন। বেশ বড়সড় স্টেশন হলেও পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে। গাইড মাইকেল (পরিবর্তিত নাম)-এর সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে দেখা হল। পার্কিং এলাকা এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে। রিক্সাভ্যানে মাল চাপিয়ে মাইকেলের সাথে শহরের প্রাচীন দেওয়াল বরাবর এটুকু পথ হেঁটে বাসে উঠলাম। স্টেশন এলাকার বাইরে অবশ্য শহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

শিআন কথাটির অর্থ পশ্চিমের শান্তি। শহরের জনসংখ্যা ৪০ লক্ষ। এখানের দ্রষ্টব্য হিউয়েন সাংয়ের স্মৃতিধন্য বিগ ওয়াইল্ড গুজ প্যাগোডা। দণ্ডায়মান হিউয়েন সাংয়ের মূর্তি ছাড়িয়ে প্রবেশপথ। বিশাল চত্বরের মধ্যে সুসজ্জিত নবনির্মিত মঠে বুদ্ধ ছাড়াও বেশকিছু অন্যান্য মূর্তি রয়েছে। পাথর ও কাঠে খোদাই করে হিউয়েন সাংয়ের জীবনগাথা প্রদর্শিত হয়েছে একটি কক্ষে। প্রাঙ্গনজুড়ে প্রচুর ফুল ও ফলের গাছ বসানো। কয়েকস্থানে দর্শকদের বিশ্রামের জন্য বেঞ্চি তৈরি করা। অনেকে সেখানে গল্প বা আলোচনায় ব্যস্ত। বহু গাছ ছেঁটে নানা আকৃতিতে গড়া। নতুন মঠের পিছনে রয়েছে ৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত মিনারাকৃতি সাততলা মূল প্যাগোডা। বহুবছর এই প্যাগোডায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেছেন হিউয়েন সাং। এখানেই রক্ষিত আছে তাঁর স্বহস্তে লিখিত ও সংগৃহীত নানা পুঁথি আর ত্রিপিটকের লিপি। আপাততঃ বন্ধ থাকায় সেই অমূল্য সম্পদ অদেখাই রয়ে গেল। মঠ দেখে লাঞ্চ সারতে চারটে বাজল। দলের কয়েকজন তাং নাচ দেখতে চাওয়ায় তাদের অনুষ্ঠানস্থলে নামিয়ে হোটেলে পৌঁছলাম ছ'টা নাগাদ। হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে কাছাকাছি রাতের ব্যস্ত শিআনের পথে ঘুরে এলাম ঘন্টাখানেক। ন'টায় নৈশাহার সেরে ঘুম।

চিনা হোটেলগুলির আতিথেয়তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সাড়ে আটটায় প্রাতরাশ সেরে তৈরি হয়ে নিলাম। বৃষ্টি পড়ছে বলে ছাতা, জ্যাকেট সঙ্গে নিতে হল। দশটার পর বাস নিয়ে চলল শিআন-এর প্রাচীন নগরপ্রাচীর দর্শনে। শহরকে সুরক্ষিত রাখতে তাং রাজারা (শাসনকাল ৬১৮-৯০৭ খৃষ্টাব্দ) প্রায় একশ বছর ধরে এই প্রাচীরবলয় নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে মিং রাজত্বে (শাসনকাল ১৩৬৮-১৬৪৪ খৃষ্টাব্দ) একে আরো সুদৃঢ় করে গড়ে তোলা হয়। ১২ মিটার উঁচু প্রাচীরের ভিত ১৫ থেকে ১৮ মিটার চওড়া। প্রাচীরশীর্ষ ১২ থেকে ১৪ মিটার চওড়া। প্রায় ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাচীরে ১২০ মিটার অন্তর আটানব্বইটি কারুকার্যশোভিত সুবিশাল কক্ষ রয়েছে রক্ষীদের জন্য। কথিত আছে নির্মাণকালে প্রাচীরের দৃঢ়তা পরীক্ষা করতে তীর নিক্ষেপ করা হত প্রাচীরে। তীর বিদ্ধ হলে সেই অংশ ভেঙে নতুন করে গাঁথা হত। গোটা প্রাচীরে চারটি তোরণদ্বার রয়েছে - পূবে চাংলে (অর্থাৎ পরমানন্দ), পশ্চিমে আনদিং (সম্প্রীতি ও শান্তি), দক্ষিণে ইয়ংনিং (চিরশান্তি) আর উত্তরে আনয়ুআন (চিরসম্প্রীতি)। প্রাচীরের ওপরে স্থানে স্থানে পুরনো ঘন্টা, কামান, আসবাব ইত্যাদি সাজানো রয়েছে। স্থানীয় ও বিদেশি বহু মানুষ প্রাচীরের ওপরে ভ্রমণরত। ইদানীং প্রাচীরের ওপর প্রতিবছর সাইকেল রেস, দৌড় প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীরের গা ঘেঁষে মাঝে মাঝে পার্ক রয়েছে অবসর ও বিনোদনের জন্য। ছোট থেকে বড় নানা বয়সের মানুষ ভিড় জমিয়েছে সেগুলিতে।

প্রাচীরদর্শন সেরে চললাম টেরাকোটা মিউজিয়াম। পথে এক ওয়ার্কশপে টেরাকোটা মূর্তির ইতিবৃত্ত জানা গেল। উত্তর চিনের এক আগ্নেয়গিরির বিশেষ মাটি মূর্তি নির্মানে ব্যবহৃত হত। আজও সেই একই মাটি দিয়ে শিল্পীরা টেরাকোটা মূর্তি গড়েন। বিভিন্ন ধরণের মূর্তির মধ্যে প্রাচীন চিনা রক্ষীদের মূর্তি সর্বাধিক জনপ্রিয়। তবে দুষ্প্রাপ্য মাটি আর জটিল নির্মাণশৈলীর কারণে মূর্তির দাম সাধারণের সাধ্যাতীত।

ইউনেস্কোর তালিকাভুক্ত শিআন-এর পুরাকীর্তি টেরাকোটা মিউজিয়ামের পুরোটাই মাটির নীচে অবস্থিত। বিশাল এলাকাজুড়ে রয়েছে পাঁচটি পিট যার মধ্যে তিনটি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত। তিনটির মধ্যে প্রথম পিটে খননকার্য শেষ হয়েছে। এখানে প্রাপ্ত হাজারখানেক সশস্ত্র রক্ষী ও অশ্বের অবস্থা বেশ ভাল, সেগুলি অনেকটা অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে যদিও অধিকাংশ অস্ত্র কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। বেশকিছু রক্ষী ও অশ্বের মূর্তি নীচ থেকে ভূপৃষ্ঠে তুলে রাখা। পিট এলাকাটি রেলিং দিয়ে ঘেরা। রেলিং ঘিরে দেশিবিদেশি কয়েকহাজার মানুষের ভিড়। মূর্তিগুলি দেখার পাশাপাশি ছবি তুলতে ব্যস্ত প্রায় সকলে। প্রায় ২২০০ বছর ধরে মাটির নীচে পাড়ে থাকা মূর্তিগুলির শিল্পশৈলী দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হতে হয়। প্রায় আধঘন্টা চোখভরে দেখে আর কিছু মূর্তি লেন্সবন্দী করে চললাম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিটের উদ্দেশ্যে। এদুটি পিটে আস্ত মূর্তি কম থাকলেও অসংখ্য ভাঙা মূর্তি রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

পুরাতত্ত্বে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা খননের পাশাপাশি প্রাপ্ত ভাঙা মূর্তিগুলি মেরামতে ব্যস্ত। তবে পোষাকের আভিজাত্যে এই দুই পিটের রক্ষীরা প্রথম পিটের রক্ষীদের তুলনায় উচ্চতর পদমর্যাদার বলে মনে হয়। তিনটে পিট ঘোরার পর মনে হল এক মহাযজ্ঞ চলেছে সমগ্র এলাকাজুড়ে। ১৯৭৬-এ জনৈক স্থানীয় চাষী এর সন্ধান পান আর সঙ্গে সঙ্গে খনন শুরু করে চিনের পুরাকীর্তি বিভাগ। তিন বছর পর ১৯৭৯-তে এটি সর্বপ্রথম জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। পাশের সংগ্রহশালায় খননে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র, পশুপক্ষী আর তৈজসপত্রের বিপুল সম্ভারও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক।

মিউজিয়ামের ভূগর্ভে দণ্ডায়মান হাজার হাজার রক্ষী আর অশ্বের মূর্তিগুলির একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা দেখে বিস্ময়ের সীমা থাকেনা। কোনও মূর্তির সাথে অন্য কোনও মূর্তির হুবহু মিল নেই, প্রতিটি মূর্তির চেহারা অনন্য। কথিত আছে সম্রাট কিন শি হুয়াং (শাসনকাল ২২১ থেকে ২০৭ খৃষ্টপূর্বাব্দ)-এর ইচ্ছা ছিল তাঁর মৃত্যুর পর ৮০০০ দেহরক্ষী তাঁর মরদেহ পাহারা দেবে। এজন্য তাঁর জীবদ্দশায় রক্ষীবাহিনীর প্রত্যেকের সশস্ত্র মূর্তি তৈরি করা হয় অশ্বাদিসহ। সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ ঘিরে অস্ত্রবাহনসহ রক্ষীদের মূর্তি দাঁড় করিয়ে মাটিচাপা দেওয়া হয়। ভূগর্ভে সদৃঢ় ভিত আর পার্টিশন দেওয়াল গড়া হয়েছিল মূর্তিগুলি সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে।

অবিস্ময়রণীয় এই কীর্তি দুঘন্টার বেশি সময় ধরে ঘুরে দেখেও যেন আশ মিটলনা। বাইরে জমজমাট দোকানপাট দেখে মনে হচ্ছে মেলা বসেছে মিউজিয়ামের প্রবেশচত্বরে। প্রচুর দেশিবিদেশি পর্যটক ঘুরছে এলাকাজুড়ে। রংবেরংয়ের নানান আকৃতির সুন্দর সুন্দর চিনা ঘুড়ি উড়ছে আকাশে, তার দর্শকও কম নয়। সবুজ ময়দানে চিনা ঘুড়িবাজদের এক একজনের লাটাই থেকে দশ-পনেরটা ঘুড়ি উড়ছে একই সূতোয়।

টেরাকোটা মিউজিয়াম দেখে বাসে চেপে চললাম শিআন রেলস্টেশনের দিকে। গন্তব্য বেজিং। পথে ডিনার প্যাক সংগ্রহ করে নেওয়া হল। ছ'টা নাগাদ স্টেশনে পৌঁছে টিকিট দেখিয়ে লাগেজ স্ক্যান করে ভেতরে প্রবেশ করলাম। আমাদের জেড-২০ নম্বর ট্রেন রাত ৮টা ১৬-য় ছাড়বে। প্রথমদিকে বেজিংয়ের ট্রেনের লাউঞ্জ ফাঁকা থাকলেও পরে ভিড় বাড়তে বাড়তে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল। শয়ে শয়ে লোক দাঁড়িয়ে ট্রেনের অপেক্ষায়। ট্রেন ছাড়ার আধঘন্টা আগে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের গেট খুলতে বানের জলের মতো যাত্রীকুল আছড়ে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। ভিড় কমতে আমরাও প্ল্যাটফর্মে ঢুকে ধীরেসুস্থে নির্দিষ্ট কোচে চেপে বসলাম। এই ট্রেনটি শিআন থেকে সরাসরি বেজিং যাবে এগার ঘন্টায়। আমাদের কোচে বারোটা ক্যুপ, প্রতি ক্যুপে মুখোমুখি দুটো করে চারটে বার্থ। ক্যুপে বেসিনের গায়ে তোয়ালে-সাবান-শ্যাম্পু-ব্রাশ-পেস্ট সব মজুত রয়েছে। সুন্দর সাজানো ক্যুপ বেশ ভাল লাগল।

তিয়েনমান স্কোয়ারে গ্রেট হলের সামনে

সকাল সাতটা কুড়িতে বেজিং পৌঁছল ট্রেন। গাইড হ্যারি প্ল্যাটফর্মে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে হাজির। বাস অপেক্ষা করছিল স্টেশনের বাইরে। মালপত্র নিয়ে বাসে উঠতেই হ্যারি আমাদের নিয়ে চলল বিশ্বের বৃহত্তম স্কোয়ার তিয়ানআনমেন-এর দিকে। সাড়ে আটটায় সেখানে পৌঁছে দেখি ইতিমধ্যেই নানান দেশের হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছেন স্কোয়ার চত্বরে। ছোটবড় নানা দলে বিভক্ত হয়ে ঘুরছে সবাই। ভিড় ঠেলে এগোলাম মাও সে তুং-এর সমাধিসৌধের কাছে। হতাশ হলাম সৌধের দ্বার বন্ধ দেখে। সচরাচর সপ্তাহে দুদিন খোলা হয় এটি, তাও পূর্বনির্দিষ্ট নয় দিনগুলি। এত কাছে এসেও মাওয়ের সমাধি দেখতে না পেয়ে ভীষণ খারাপ লাগল। অগত্যা চিনের সংসদ ভবন গ্রেট হল অফ দি পিপল আর সুউচ্চ বেলেপাথরের শহীদস্মারক পেরিয়ে চললাম এখানকার বড় আকর্ষণ নিষিদ্ধনগরীর পানে। বিশাল স্কোয়ারে প্রচুর ফুলের কেয়ারি এলাকার সৌন্দর্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। চিনের পথেঘাটে সর্বত্র দেখছি ফুলের গাছ, ফুলের কেয়ারি। এত পুষ্পপ্রেম আর কোথাও চোখে পড়েনি।

সুন্দর সুবিশাল স্কোয়ারে ঘন্টাখানেক কাটিয়ে হাজির হলাম নিষিদ্ধনগরীর দোরগোড়ায়। টিকিট আগেই কাটা ছিল। দুপাশে ফুলের বাগান আর ঝরনার মাঝখান দিয়ে নিষিদ্ধনগরীর এদিকের প্রবেশপথ তিয়ান-আন-মেন গেট। গেটের মাথায় শোভা পাচ্ছে মাও সে তুং-এর বহুবর্ণ চিত্র। দ্বার পেরিয়ে প্রবেশ করলাম নগরীর অভ্যন্তরে। মিং রাজাদের আমলে ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে এই নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকায় পরবর্তীকালে এই প্রাসাদনগরীর নাম হয়ে ওঠে নিষিদ্ধনগরী। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজার শাসনকেন্দ্র ছিল এখানে। প্রশস্ত পরিখা ও সুউচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত নগরীর প্রথম পর্যায়ে রয়েছে বহির্প্রাঙ্গণ। এর পর পর্যায়ক্রমে রয়েছে রাজকর্মচারীদের আবাসন, রাজার মন্ত্রণাগৃহ আর একেবারে অভ্যন্তরে রাজার বাসগৃহ। প্রতিটি পর্যায়ে প্রবেশের জন্য রয়েছে উঁচু প্রাচীরের মাঝে নির্মিত সুদৃঢ় প্রবেশদ্বার। প্রতিটি দ্বারের আলাদা নাম রয়েছে - যেমন মেরিডিয়ান গেট, গেট অফ ডিভাইন মাইট ইত্যাদি। প্রাসাদের প্রধান কক্ষ আর বিশ্রামগৃহগুলিরও পৃথক পৃথক নাম রয়েছে - যেমন হল অফ সুপ্রিম হারমনি, ঝোংগে হল, হল অফ প্রিজারভিং হারমনি, প্যাভিলিয়ন অফ টেন থাউজ্যান্ড স্প্রিং, প্যাভিলিয়ন অফ ফ্লোটিং গ্রিন ইত্যাদি। সাত লক্ষ বর্গমিটারের অধিক এলাকাজোড়া নগরীতে সেকালে রাজপরিবার, রক্ষী ছাড়াও মন্ত্রী - সভাসদ - রাজকর্মচারীসহ কয়েক হাজার মানুষের বাস ছিল। প্রতিটি বাসগৃহ, সভাকক্ষ ও বিশ্রামাগার অপূর্ব নির্মাণশৈলী ও শিল্পকলায় সমৃদ্ধ। প্যাগোডাকৃতি ছাদগুলির কোনোটা দোচালা, কোনোটা চারচালা। বেশকিছু প্রাচীন আসবাব ও তৈজসপত্র সংরক্ষিত হয়েছে বিভিন্ন কক্ষে ও প্রাসাদের প্রাঙ্গণজুড়ে। মিং রাজাদের এই বিস্ময়কর কীর্তি তার বিশালত্ব আর অতুলনীয় গঠনশৈলীর জন্য ঠাঁই পেয়েছে ইউনেস্কোর বিশ্ব পুরাকীর্তির তালিকায়।

মেরিডিয়ান গেট, নিষিদ্ধ নগরী

ঘন্টাতিনেক ধরে নিষিদ্ধনগরী দেখার পর বাস পৌঁছে দিল হোটেলে। স্নানান্তে আজকের লাঞ্চ চিনা রেস্তোরাঁয়। ফলের রস, চাউমিন আর ফিশফ্রাই মিলিয়ে মন্দ খেলাম না। লাঞ্চের পর রওনা হলাম চিনা রাজাদের গ্রীষ্মাবাস সামার প্যালেস দেখতে। দুপাশে পাহাড়ঘেরা লেকের পাড়ে অবস্থিত সামার প্যালেসের নির্মাণকাজ ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। চিং রাজাদের আমলে এটি প্রমোদকানন হিসাবে তৈরি হলেও পরবর্তীকালে একে চিনা রাজাদের গ্রীষ্মাবাসে পরিণত করা হয়। বিগত দুশতকের মধ্যে প্রাসাদটি দুবার ধ্বংস হলেও দুবারই প্রাসাদ পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। বিশাল দরজা পেরিয়ে প্রাসাদে ঢুকতেই এক বিরাট আকারের একটি ব্রোঞ্জের পাত্র চোখে পড়ল। এটি ধূপদানি হিসাবে ব্যবহৃত হত সেকালে। এরপর ড্রাগন ও ফিনিক্সের মূর্তিখচিত হলঘর পেরিয়ে এলাম প্রাসাদ লাগোয়া লেকের পাড়ে। প্রাসাদের কিছু সাজানো কক্ষ দর্শকের নজর কাড়ে। লেকে নৌকায় চেপে ঘুরছে অনেক পর্যটক আর পাড়ঘেঁষা পদ্মবনে ভাসছে প্রচুর পদ্মের পাতা ও চাক।

সন্ধ্যায় গেলাম চায়না ন্যাশনাল অ্যাক্রোবেটিক ট্রুপ-এর সুবিখ্যাত চিনা অ্যাক্রোবেটিক শো দেখতে। সওয়া সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত চলল সাবলীল অথচ উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমহর্ষক নানা ধরণের ব্যালান্সিংসহ ছন্দোবদ্ধ ক্রীড়াপ্রদর্শনী। কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীর সমন্বয়ে গঠিত দলের প্রতিটি সদস্যের উপস্থাপনা ছিল দমবন্ধ করে দেখার মতো।

পরদিন সকালে চিনের মহাপ্রাচীর (চিনা ভাষায় চ্যাং চেং) যাওয়ার পথে পড়ল জেড মিউজিয়াম। এটি জেড পাথরের শিল্পকীর্তির এক প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র। ধূসর ও সবুজবর্ণের জেড পাথরের মূর্তি, পশুপাখী, অলঙ্কার সবই অপূর্ব। দামও মানানসইরকম আকাশছোঁয়া। তাই সংগ্রহের বদলে স্মৃতি হিসাবে লেন্সবন্দী করে রাখলাম কিছু শিল্পকীর্তি। পুনরায় বাসে চেপে পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম চিনের মহাপ্রাচীর - এর দুয়ারে পৌঁছলাম পৌনে এগারটায়। চলমান বাস থেকে দেখা আবছা মহাপ্রাচীরের মহিমান্বিত রূপ ধরা পড়ল বাস থেকে নামতেই। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম দুপাশে বিস্তৃত সুউচ্চ প্রাচীরের দিকে। ঘোর কাটল গাইডের ডাকে। ফুলগাছে সাজানো চত্বরের ওপারে পাথরের খিলানাকৃতি দ্বার ডিঙিয়ে এগোলাম প্রাচীরপানে।

প্রথমে হুন ও পরে মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করতে বিভিন্ন চীনসম্রাট রাজ্যের উত্তরে পাথর, ইঁট ও মাটি দিয়ে একাধিক দীর্ঘ প্রাচীর তৈরি করেন। তাদের মধ্যে চিনের প্রথম সম্রাট কিন শি হুয়াং সর্বপ্রথম ২১৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে রাজ্যের উত্তর সীমান্ত বরাবর এই প্রাচীর নির্মাণ শুরু করেন। প্রায় ২৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাচীর তৈরিতে লেগে যায় কয়েক দশক। পরবর্তীকালে হান এবং তারও পরে মিং রাজত্বকালে এর দক্ষিণে নতুন করে পৃথক পৃথক মহাপ্রাচীর গড়ে তোলা হয়। আজকের মহাপ্রাচীরটি মিং রাজত্বে নির্মিত এবং পূব-পশ্চিমে এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৩০০ কিলোমিটার। প্রাচীরে প্রায় ২৫০০০ পর্যবেক্ষণচৌকি রয়েছে। প্রাচীরের গড় উচ্চতা ৮ মিটার আর প্রস্থ প্রায় ৫ মিটার আর এর ওপরে দুপাশে সুরক্ষাপ্রাচীর গড়া। বিভিন্ন রাজার আমলে প্রাচীর

নির্মাণ চলেছে সুদীর্ঘকাল ধরে আর নির্মাণকালে প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যা মহাপ্রাচীরের গরিমাকে অনেকটা ম্লান করেছে।

মহাপ্রাচীরে ওঠার জন্য অনেক স্থানে সিঁড়ি রয়েছে। আমরা এসেছি সেরকম একটা জায়গা জুয়ংগুয়ান পাস। এখানে ডান ও বাম দুদিকেই সিঁড়ি উঠে গেছে প্রাচীরের শীর্ষ পর্যন্ত। বামদিকের সিঁড়ি বেশি খাড়া হওয়ায় ডাইনের সিঁড়ি ধরলাম। বয়সের কারণে গুটিগুটি পায়ে উঠছি আমি আর অনু। লক্ষ্য চূড়ায় অবস্থিত প্রহরীকক্ষে পৌঁছনো। সিঁড়ির দুপাশের লোহার রেলিং বা দেওয়াল ধরে উঠছি। নানা দেশের শয়েশয়ে আবালবৃদ্ধবনিতা উঠছে, নামছে সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়িতে মাঝেমাঝে প্রশস্ত ল্যান্ডিং রয়েছে। অনেকে বিশ্রাম নিচ্ছে সেখানে। আমরা ল্যান্ডিং ছাড়া সিঁড়িতেও দাঁড়াচ্ছি মাঝেমধ্যে। আধঘন্টা পর নীচের দিকে তাকাতে মনে হল অর্ধেকটা উঠে এসেছি এরমধ্যে। মনে একটু বল পেলাম। আবার থেমেথেমে ওঠা। আরো মিনিট কুড়ি পর চাইলাম ওপরে। এবার মনে হল আর মাত্র সিকিভাগ বাকী। অনুকে ক্লান্ত দেখে এবার একটু লম্বা বিরতি নিলাম। এখানে এক বয়স্ক জাপানী দম্পতির সঙ্গে সহাস্য শুভেচ্ছাবিনিময় হল। শেষপর্বে ওঠার পথে কিছুটা পরপর দাঁড়াচ্ছি আমরা। অবশেষে প্রশস্ত প্রাচীরচত্বরে পৌঁছে দোকানপাট ছাড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম প্রাচীরের মাথায় অবস্থিত প্রহরীকক্ষের সামনে। ঘড়িতে তখন বারটা কুড়ি। অর্থাৎ এক ঘন্টার কিছু বেশি সময় লেগেছে পুরোটা উঠতে। ওপরে পৌঁছে মনটা অপার আনন্দে ভরে গেল, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। ক্রমে প্রহরীকক্ষের পিছনের চাতালে দাঁড়িয়ে নীচে তাকালাম। চোখে পড়ল ঝোপঝাড়, মাঠ, রেললাইন। উল্টোদিকের প্রাচীরচূড়া ঝাপসা দেখাচ্ছে এপার থেকে। প্রহরীকক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে দুপাশে চোখ ফেরালাম যতদূর প্রাচীর দেখা যায়। নীচের গাড়ি, লোকজন দেখাচ্ছে পুতুলের মত। এভাবে মিনিট দশ-পনেরো কাটল প্রাচীরশীর্ষে।

ওঠার পর এবার নামা। সিঁড়ির ধাপগুলো বেশ উঁচু হওয়ায় সেটাও কম কষ্টকর নয়। ভারসাম্য হারালে বা পা পিছলে গেলে শ'খানেক ফুট নীচে গড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা। সাবধানে নামতে লাগলাম। নামার পথেও শুভেচ্ছাবিনিময় হল কিছু ভিনদেশি পর্যটকের সাথে। স্থানীয় সাফাইকর্মীরা সদাতৎপর সিঁড়ির পরিচ্ছন্নতা রক্ষায়। দেড়টা নাগাদ নীচে নেমে চাইলাম ওপরদিকে। আরেকবার চোখভরে দেখলাম দুপাশের মহাপ্রাচীর।

নীচের পুষ্পশোভিত প্রাঙ্গণ আর দোকানপাট ছাড়িয়ে বাসে উঠলাম। পিছনে রইল মানবজাতির অবিস্মরনীয় কীর্তি চিনের মহাপ্রাচীর। পথে ভারতীয় লাঞ্চ সেরে অলিম্পিক স্টেডিয়াম বার্ডস নেস্ট দেখে উপস্থিত হলাম ভেষজ চা-কেন্দ্রে। এখানে অতিথিদের সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়ে নানাধরণের ভেষজ চায়ের গুণাগুণ বর্ণনার সাথে সাথে চা পান করানো হয় প্রত্যেককে। জুঁই, গোলাপ, লিচু ইত্যাদির গন্ধ ও স্বাদের চা পান করলেও কোনোটাই তেমন মনে ধরলনা। তাছাড়া দামও আকাশছোঁয়া - আট থেকে দশ হাজার টাকা প্রতি কিলো। অগত্যা চা আস্বাদন করেই এখানকার পর্ব সারা হল। রাতে ভারতীয় ডিনারের সাথে বাড়তি পাওনা ডাইনিং হলের মঞ্চে হিন্দি গানের সাথে ঘাঘরা-চোলি পরিহিত চিনা নর্তকীর ভারতীয় ফিল্মী নাচ। খাওয়া শেষের আগেই বৃষ্টি শুরু হল আর তাড়া করে চলল হোটেল পর্যন্ত।

বেজিং চিড়িয়াখানায় পান্ডার দল

সকালে প্রাতরাশ সেরে চললাম বেজিং চিড়িয়াখানা। হ্যারি ট্যাক্সি ডেকে আমাদের গন্তব্য বুঝিয়ে দিল চালককে। দুপাশে পুষ্পশোভিত পথবেয়ে পৌনে আটটায় পৌঁছলাম চিড়িয়াখানা। জনপ্রতি ১৫ ইউয়ানের টিকিট। ভিতরে ঢুকেই পান্ডার ঘর। এরজন্য আলাদা প্রবেশমূল্য ৫ ইউয়ান করে। দুটি ঘেরা খাঁচায় তিনটি করে ছ'টি পান্ডা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝেমাঝে ওপর থেকে জল স্প্রে করা হচ্ছে পান্ডার আস্তানাকে আর্দ্র ও ঠাণ্ডা রাখতে। শিশুদের অতিপ্রিয় সাদাকালো নিরীহ প্রাণীগুলির চালচলন ভারী মজার। ওদের মধ্যে খুনসুটি লেগেই আছে। বাঁশের কচি পাতা চিবাচ্ছে কেউ কেউ। চিনের পাহাড়ের বাসিন্দা এই প্রাণীদের চোরাশিকারীরা হত্যা করে ওদের সুন্দর চামড়ার লোভে যা অত্যন্ত চড়া দামে বিকোয় দেশবিদেশের চোরাবাজারে। সম্প্রতি চিনে পান্ডা ধরা, রাখা, বিক্রি বা হত্যার অপরাধে প্রাণদন্ডের বিধি চালু হয়েছে। এতে অনেকটাই কমেছে পান্ডার চোরাশিকার।

পান্ডাদর্শন সেরে চললাম অন্যান্য প্রাণী দেখতে। প্রচুর পাখি, বিভিন্ন জাতের বানর, বাঘ-সিংহ, কুমীর ছাড়াও অনেক প্রাণী রয়েছে বিশাল এলাকাজুড়ে। একটা বড় ঝরনা আর কয়েকটি জলাশয় চোখে পড়ল। সুন্দর সাজানো চিড়িয়াখানায় রয়েছে একটি বিশাল অ্যাকোয়ারিয়াম। পথে অনেককে সেটির ব্যপারে জিজ্ঞাসা করলে সকলেই দুর্বোধ্য চিনা ভাষায় কী বলল বুঝলাম না। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ পৌঁছে গেলাম অ্যাকোরিয়ামে। তবে আবার সমস্যা দেখা দিল। এর প্রবেশমূল্য ১১০ ইউয়ান জনপ্রতি। অত ইউয়ান সঙ্গে না থাকায় ডলার দিয়ে টিকিট চাইলাম। কাউন্টার থেকে জবাব এল - ডলার নো, ইউয়ান। বুঝলাম ডলার দিয়ে টিকিট কাটা যাবেনা। দুঃখিত মনে ফিরে চললাম। পাথর বিছানো পরিচ্ছন্ন পথ ধরে এগোলাম পেঙ্গুইনের ঘরের খোঁজে। ভাষা সমস্যা এবারও প্রকট হয়ে দেখা দিল। যাই হোক ডিসপ্লে বোর্ড দেখে আর কিছুটা বিবেচনাশক্তি প্রয়োগ করে অবশেষে পৌঁছলাম পেঙ্গুইনের ঘরে। দুদিক কাঁচে ঘেরা প্রায় ৪০ ফুট লম্বা ৩০ ফুট চওড়া এলাকায় কৃত্রিম বরফ আর স্বচ্ছ জলে ঘুরছে, সাঁতার কাটছে পনেরো-কুড়িটা ছোট প্রজাতির সাদাকালো পেঙ্গুইন। বরফে ওদের হাঁটাচলা ভারী মজার। কাঁচের দেওয়াল থাকায় জলের নীচে ওদের ডুবসাঁতারও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আমাদের মাঝে এক খুদে দর্শক তো ওদের কান্ড দেখে লাফালাফি শুরু করে দিল। মিনিট পনেরোয় পেঙ্গুইন দেখা সাঙ্গ করে হোটেলে ফিরলাম।

লাঞ্চ সেরে ফাঁকা সময়টা কাটালাম পথপরিক্রমায়। ফুটপাথের একধারে সারসার সাইকেল দাঁড় করানো। ট্রাম,বাস, কার, ট্যাক্সি, অটো চলেছে ঝকঝকে ছয় লেনের মসৃণ রাস্তায়। তিনচাকার একটা ছোট কার পার্কিং করা রাস্তার পাশে। দোকানপাট, শপিংমলে বেশ ভিড়। অধিকাংশ মানুষ ব্যস্ত যে যার কাজে। পাশের একটা বাজারে ঢুকছি, হঠাৎ এক চিনা মহিলা অনুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর অনুর শাড়ির সামনে, পিছনে নাড়াচাড়া করতে করতে হাত-পা নেড়ে চ্যাং চুং করে কী যেন বলতে লাগল। মহিলার অঙ্গভঙ্গী দেখে মনে হল এতবড় শাড়িটা কিভাবে পরা হয়েছে সেটাই বোধহয় সে বুঝতে চাইছে। দেখেবুঝে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে সে হাঁটা দিল অন্যপথে আর আমরা বাজারে ঢুকলাম। মাঝারি আকারের বাজারে জামাকাপড়, ফল, সবজি, ঘরকন্নার জিনিসপত্র সবই বিকোচ্ছে। পরিচিত আলু-লাউ-বেগুনের সঙ্গে নানাধরণের নতুন সবজি আর ফল দেখলাম বাজারে। বেরোনোর পথে দেখি এক দোকানে বিশালকায় ধোসা বানাচ্ছে ক্রমাগত। ডিম-মাংস-সবজি আর সসের পুর দেওয়া ধোসা বিকোচ্ছে খুব। বুঝলাম এটি ধোসার চিনা সংস্করণ। ফুটপাথে বিক্রি হচ্ছে জ্যান্ত রুই, কাঁকড়া আর মাঝারি সাইজের চিংড়ি। তাজা চিংড়ি দেখে জিভে জল এসে যাচ্ছিল। এইসব দেখতে দেখতে ফেরার সময় হয়ে এল।

হোটেলে ফিরে লাগেজ বাসে তুলে চললাম বেজিং বিমানবন্দর। অনেক আনন্দ আর স্মৃতিকে সঙ্গী করে সেখান থেকে কুনমিং হয়ে রাতে পৌঁছলাম কলকাতা।

স্টোন ফরেস্ট, কুনমিং

~ চিনের আরও ছবি ~

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অফিসার শ্যামলেন্দুবিকাশ সরকারের নেশা ইতিহাস ও প্রকৃতির টানে দেশবিদেশ ভ্রমণ। ভালো লাগে পুরনো গান শুনতে, বই পড়তে আর মাঝেমধ্যে লেখালেখিও।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com

রুপোলি রেশি আর সোনালি সিলারি গাঁও

পল্লব ব্যানার্জি

~ রেশিখোলা-সিলারিগাঁও-এর আরও ছবি ~

অফিস কলিগ'রা বলল - "নর্থ বেঙ্গল? আ-বা-র??"
ছাত্রছাত্রীরা বলল - "উফ্ - আপনিও তো যেন আমাদের মতোই পরীক্ষার পড়া রিভিশন দিচ্ছেন - এক জিনিস বারবার..."
বন্ধুরা বলল - "রবি ঠাকুর কি বলেছেন জানিস তো? 'রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি' - আর তো কোনদিন বাংলার বাইরে যেতেই পারবিনা। কি আছে বলতো ওখানে?"
সত্যিই তো। এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। আর থাকলেও ওদের বোঝানোর মতো ভাষা আমার নেই। সত্যিই "উত্তরবঙ্গে কি আছে" এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক ভেবে একটাই শব্দ খুঁজে পেলাম - 'টান'। দয়া করে জিজ্ঞেস করবেন না - কিসের, কতটা, কেমন - ইত্যাদি।
এই 'টান'-এর ওপর ভর করেই আবার পাড়ি দিলাম উত্তরবঙ্গে। এবার বেছেছি দুটো এমন জায়গা যেখানে দিনের বেলায় শুধুই পাখির ডাক আর রাতের বেলা ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ। রেশিখোলা - আর সিলারি গাঁও।
সবার আগে যেটা দরকার তা হল - দল ঠিক করা। আট জনের একটা দল বানাতে পারলে সব থেকে ভাল। এই পথে গাড়ি যেহেতু সহজে মেলে না, তাই শুরুতেই একটা গাড়ি বুক করে ফেলা আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আর তখনই বুঝতে পারবেন 'দল' এর সুবিধাটা কোথায়। হাতে গোনা যে হোটেলগুলো আছে, তাতেও চার-শয্যা (ফোর-বেডেড) ঘরই বেশি। সেখানেও দলে ভারি হলে সুবিধা।

রেশি খোলা

একটা গাড়ি রিজার্ভ করে নিলাম - নিউ জলপাইগুড়ি থেকে সো-জা রেশিখোলা। নেপালি ভাষায় খোলা মানে নদী বা পাহাড়ি ঝোরা। 'রেশি' নদীর উপত্যকা বলে এর নাম রেশিখোলা। আমরা ধার্মিক বাঙালিরা এটাকেই 'ঋষি'খোলা বানিয়ে ফেলেছি। এর এক ধারে সিকিম, আর এক ধারে পশ্চিমবঙ্গ। মাঝে স্বাধীন ভাবে ছুটে চলেছে রেশি। শীতে জল খুব বেশি না হলেও স্রোত ভালোই। দু'দিকের পাহাড় বেশ খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে নদীর কোলে। গাড়ি থেকে নেমে প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে হোটেল। পৌঁছানোর একটু আগে গাড়িতে বসেই হোটেলে (অবশ্যই আগে থেকে বুকিং করে রাখবেন) ফোন করুন। পোর্টার আসবে। ওরাই মালপত্তর বয়ে নিয়ে যাবে। ওদের পিছন পিছন চলুন। তবে এটা তো আর হাওড়া স্টেশন নয় যে সবসময় মাল-বাহককে নজরে নজরে রাখতে হবে। এখানে ওরা ইচ্ছে করে হারিয়ে যায় না। বরং দু-পাশের গাঢ় সবুজের মধ্যে দিয়ে নামতে নামতে আপনিই হয়তো হারিয়ে যাবেন মায়াচ্ছন্ন হয়ে। গাড়ি থেকে নামার পর ঝরনার জলের একটা মৃদু শব্দ কানে আসবে। সেটাই ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে গর্জনে পরিণত হবে। নদীর ওপর একটা বাঁশের সাঁকো আছে যেটা বাংলা আর সিকিমের মধ্যে যোগাযোগ রেখেছে। আরও একটু অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় হলে স্থানীয় লোকের হাত ধরে হেঁটে হেঁটেও নদী পেরোনো যায়। নাহলে মালপত্তরগুলো ঘরে রেখে নিজেকে রেশি-র কাছে সঁপে দেওয়া। পাখি আর প্রজাপতির মেলা বসেছে সেখানে। নদীর কুলকুল শব্দের সংগতে ঝিঁঝিঁ আর রাতচরা পাখির আওয়াজ। ঘরের বাইরে আলো বলতে মাথার ওপরের ওই চাঁদ। সেই চাঁদের আলো নদীর জলে আর গাছের পাতায় পড়ে তৈরি হয় রুপোলি এফেক্ট। নদীর উল্টো দিক থেকে ভেসে আসে বিরহীর মন কেমন করা বাঁশির সুর।
রেশিখোলাতে আতিথেয়তা পেলাম বেশ ভালই। ব্যবহার আর নির্জনতার দিক থেকে থাকার ভালো জায়গা 'রেশি রিভার রিসর্ট'। বলে রাখা ভালো যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সব খাবার খরচা ওদের বুকিং চার্জের মধ্যেই ধরা থাকে। সকালে লুচি তরকারি সঙ্গে চা, দুপুরে ভাত-ডাল-সব্জি-ভাজা আর

ডিমের কারি, সন্ধ্যেবেলা পকোড়া সহযোগে চা, রাতে মুরগির কারি আর রুটি।
গতকাল সন্ধে থেকেই লক্ষ্য করছিলাম দুই সঙ্গী কেমন যেন মনমরা। বেশ বুঝতে পারছি - শহরের জাঁকজমক থেকে দূরে ওরা থাকতে চায়না। বারান্দায় দেখা হতেই একবার সাহস করে বাপ্পা আর সৌরভকে জিজ্ঞেস করলাম - "কি রে? পকোড়া ভালো লাগছে না? তোরা অন্য কিছু খাবি?" তার উত্তরে যা শুনলাম তাতে হাসব না কাঁদব না অবাক হব, বুঝতে পারলাম না। বাপ্পা গম্ভীর মুখে জানতে চাইল - "এখানে ফুচকার দোকান নেই?" দিগন্ত বিস্তৃত ঘন জঙ্গল, মাথার ওপর দ্বাদশীর চাঁদ, আর তার আলোয় চকচক করতে থাকা রুপোলি 'রেশি'র দিকে একবার চোখ বুলিয়ে খুব সংক্ষেপে জবাব দিলাম - "না রে"। বাপ্পা যেন ওর অপ্রাপ্তির দুঃখটাকে মেনে নিয়ে বলল - "ঠিক আছে, কী আর করা যাবে? কাল তো যাচ্ছি সিলারি গাঁও। ওখানে নিশ্চই পেয়ে যাব", বলে ঘরে ঢুকে গেল। আমি মনে মনে জানি - ওখানেও ওদের নিরাশ হয়েই থাকতে হবে। বেশ বুঝতে পারলাম - শিলিগুড়ি নিদেন পক্ষে কালিম্পং না পৌঁছানো পর্যন্ত ওদের মুখে হাসি দেখতে পাব না।

সিলারি গাঁও

সকালে গাড়ি নিয়ে প্রথমেই গেলাম - পেডং। এখানকার বিখ্যাত মনাস্ট্রিটা পথেই পড়ে। বৌদ্ধ গুম্ফার বারান্দা থেকে চারপাশটা দেখলে মন ভরে যায়। নীল আকাশে টুকরো টুকরো সাদা মেঘের তলায় ছোট্ট পাহাড়ি শহর পেডং। শহর মানে কিন্তু গ্যাংটক বা দার্জিলিং এর মতো ঘিঞ্জি নয়। একটা হাই স্কুল (St. George High School), একটা জিপ / ট্যাক্সি স্ট্যান্ড আর কয়েকটা পাকা বাড়ি।
পেডং দেখে আবার গাড়ি ছুটল। খানিকটা রাস্তা বেশ মসৃণ। তারপর শেষ চার কিলোমিটার শুরু হল - যেন ড্যাম্পিং রোড। পাথর ফেলা রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ি চলল লাফাতে লাফাতে। একেবারে 'বিরু তামাং'-এর হোমস্টে সিলারি গাঁও রিট্রিটে থামল। এই বিরু তামাংই এখানকার সর্বেসর্বা।
এখানে তিন-চারটে দারুণ স্পট রয়েছে হেঁটে ঘোরার জন্য - রামেটি ভিউ পয়েন্ট - যেখানে দাঁড়ালে আপনি পায়ের তলায় তিস্তা নদীর চোদ্দটা বাঁক দেখতে পাবেন আর একই সঙ্গে মাথার ওপর পাবেন ঝলমলে কাঞ্চনজঙ্ঘা। দাক্‌শাম্ ফোর্ট - গাইড ছাড়া যাবেন না। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের ওপরে প্রায় চারশো বছরের পুরোন কেল্লার ধ্বংসাবশেষ (এখন জঙ্গলে এমন ছেয়ে গিয়েছে যে বোঝাই যায় না)। জোঁক থেকে সাবধান। নুন এর প্যাকেট রাখুন সঙ্গে। সাইলেন্ট ভ্যালি - এখানে এসে না দাঁড়ালে এই জায়গার নীরব সৌন্দর্য বোঝানো মুশকিল। ইচ্ছেগাঁও - মাত্র তিন-চার কিলোমিটার এর মধ্যে আর একটা গ্রাম, আর একটা নতুন উঠে আসা ট্যুরিস্ট স্পট।

হোম স্টে-র বারান্দা থেকে

সূর্যের আলো থাকতে থাকতেই আকাশে কেমন ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠেছে, পাখিদের কিচির মিচির কানে আসছে। পাহাড়ি ময়নার মিষ্টি শিস্ - দূরে ওই বড় গাছটায় উড়ে এসে বসছে। উজ্জ্বল নীল রঙের পাখিটার বাসা হোটেলের পাশের মরা গাছটার কোটরে- ওর নাম ব্লু ফ্লাইক্যাচার। সকালে রোদ উঠলে মিনিভেট, সিবিয়া, ব্ল্যাক বুলবুল-এর রঙে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। সন্ধে নামছে। গরম গরম চা আর পকোড়ার আশায় চাদর জড়িয়ে বারান্দায় গিয়ে বসি। পাহাড়ের নীচে শহরে যখন আলো জ্বলে দেখতে অপূর্ব লাগে।
পরের দিন ভোরের আবছা আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘার অবয়ব। ধীরে ধীরে সিঁদুর-পরানোর ভঙ্গিতে সূর্যের প্রথম কিরণ পড়ল তার চূড়ায়। এরপর শুধু রঙ বদলের খেলা। যেন সারা পাহাড় জুড়ে আগুন লেগেছে।
তারপরে শুধুই মুগ্ধতা।

~ রেশিখোলা-সিলারিগাঁও-এর আরও ছবি ~

পল্লব ব্যানার্জি - স্কুলশিক্ষক পল্লব ব্যানার্জির নেশা ঘুরে বেড়ানো আর ছবি তোলা। নিজের যা কিছু ভালো লাগে, তা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে আনন্দ পান। আর সেটা করতে গিয়েই তাঁর মনে হয়েছে বেশির ভাগ বাঙালির মধ্যেই এক ভবঘুরে মন রয়েছে। শুধুমাত্র তাকে জাগিয়ে তোলার অপেক্ষা। সেই তাগিদেই লেখা আর ছবি তোলার কাজে মন দিয়েছেন। শহর বা চেনা জায়গা নয়, অনেক দূরে যেখানে দিনে পাখির ডাক, আর রাতে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ থাকে না সেই জায়গাই তাঁর ভবঘুরে মনকে ডাকে।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

রাঙামাটির দেশ ঝাড়গ্রামে

পলাশ পান্ডা

~ ঝাড়গ্রামের তথ্য ~

অনেক দিন থেকেই মনটা কেমন পালাই পালাই করছিল। হাতে ছুটিও তেমন নেই, কম সময়ে বেড়িয়ে আসার একটা জায়গা বাছতে গিয়ে প্রথমেই কেন জানি লালমাটির দেশ ঝাড়গ্রামের কথা মন এল। অফিসের দুই বন্ধুকে সঙ্গী করে এক শনিবার অফিস ছুটির পর বেরিয়ে পড়লাম।
ঝাড়গ্রাম স্টেশনে নামলাম, তখন ঘড়িতে সন্ধ্যে ছ'টা। ওখানকারই এক পুরোনো বন্ধু, মুকুল, আগে থেকেই গেস্টহাউস ও পরের দিন বেড়ানোর জন্য গাড়ি বুক করে রেখেছিল। স্টেশনে নেমে দেখি আমাদের জন্য দাঁড়িয়েও আছে। গেস্টহাউসে পৌঁছে ড্রাইভারের সঙ্গে পরের দিনের প্ল্যান নিয়ে বসে পড়লাম। কাল দুপুরে ট্রেন, সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে হবে আশপাশটা দেখে নেওয়ার অন্য।
অ্যালার্ম বাজার আগেই ঘুম থেকে উঠে চটপট তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মুকুলও আজ সারাদিনের সঙ্গী। গাড়ি এন.এইচ. ফাইভ ধরে বেলপাহাড়ির দিকে পাড়ি দিল। তখনও সকালের ঘুম ভাঙেনি, হালকা কুয়াশার চাদর ঘিরে রয়েছে তাকে। কিছুটা যাওয়ার পর রাস্তার ডানদিকে চোখে পড়ল এম.পি.এস. গ্রুপস অফ কোম্পানিজ-এর গেট। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এটা একটা ট্যুরিস্ট স্পট ছিল, কিন্তু এখন আর ঢুকতে দেওয়া হয় না। শহর ছাড়িয়ে এবার শাল-শিমুলের জঙ্গলের পথ ধরলাম। কিছুটা যাওয়ার পর দহিযুড়ি থেকে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়েছে। ডানদিকের রাস্তাটা বিনপুর হয়ে বেলপাহাড়ি গেছে। আমরা ওটা না ধরে বাঁদিকের রাস্তাটা ধরলাম, এটা একটু শর্টকাট হয়। এপথে কিছুটা এগোলে শুরু হয় কুশবনির জঙ্গল। জঙ্গলের দু'ধারে শাল-শিমুলের প্রাধান্য বেশি। যাওয়ার সময় গা একটু ছমছম করছিল বৈকি। একটা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে নেমে জঙ্গলের ছবি তুলব বলতে ড্রাইভার সরাসরি না করে দিল। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল কিন্তু কিছু করার নেই, কারণ ড্রাইভার আগের দিনই বলে দিয়েছিল রাস্তায় যেখানে সেখানে নামা যাবে না। যাইহোক, সাত কিলোমিটার জঙ্গলটাকে অতিক্রম করে একটু লোকালয়ের কাছাকাছি এসে প্রথমবার গাড়ি দাঁড় করালো। নামতেই প্রথমবার ঠাণ্ডা অনুভব করলাম। মেঘলা পরিবেশ, হাল্কা বাতাস বয়ে চলেছে, সঙ্গে দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে। বেশিক্ষণ বাইরে না থেকে আবার গাড়িতে উঠে পড়লাম। দহিযুড়ির পর সবচেয়ে বড় জনপদ হ'ল পানিহাটি। পানিহাটিতে না থেমে সোজা বেলপাহাড়ির দিকে চললাম।

বেলপাহাড়ির পথে

প্রায় ৪৮ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে অবশেষে বেলপাহাড়ি বাজারে এসে পৌঁছলাম। বেলপাহাড়ি বাজারটা মোটামুটি বড়। আজ এখানে হাটবার। স্থানীয় চাষিরা নিজেদের মাঠের সবজি নিয়ে বাজারে এসেছে বিক্রির জন্য। গাড়ি থেকে নেমে বাজারটা একটু ঘুরে দেখলাম। আমাদের এক সঙ্গী সেই বাজার থেকে টাটকা টম্যাটো ও একটা বাঁধাকপি বেশ সস্তাতে কিনেও ফেলল। আমারও ইচ্ছা করছিল, কিন্তু বইবার ভয়ে দেখে-দেখেই কাটালাম। সকাল সকাল বেরিয়েছি, খাওয়া হয়নি কিছুই। এমন কী চা-ও নয়। বাজারের এক জায়গায় দেখলাম গরম গরম লুচি ভাজছে। লোভ সামলাতে পারলাম না। সেখানেই গরম লুচি, ঘুগনি ও চা সহযোগে জলযোগ সারলাম। এই বেলপাহাড়ি থেকে ডানদিকে একটা রাস্তা বেঁকে গেছে। ওই রাস্তা ধরে কিছুটা গেলে পড়ে ঘাঘরা ওয়াটার ফলস্। তারাফেনি ব্যারেজের জলধারা থেকে সৃষ্টি হয়েছে ঘাঘরা ওয়াটার ফলস। বর্ষাকালে এর প্রকৃত রূপটা অনুভব করা যায়। এখন জল না থাকায় প্রায় শুকনো।

কাঁকরাঝোর

ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা চললাম কাঁকরাঝোরের উদ্দেশ্যে। রাস্তা সরু হলেও অবস্থা খুব একটা খারাপ নয়। নতুন করে রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে। বেলপাহাড়ির পর থেকেই চারপাশের পরিবেশটা বদলাতে থাকল, বড় বড় গাছগুলো দূরে সরে গিয়ে ঘাসে মোড়া ছোট ছোট সবুজ টিলা দেখতে পেলাম। মেঘলা থাকায় হালকা কুয়াশায় ঢেকে রয়েছে। বুঝতেই পারলাম, আমরা কাঁকরাঝোর এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। চাষের সময় রাস্তার ধারের জমিগুলো সবুজ ধানে ভরে যায়, এখন চারদিক ফাঁকা ধু ধু করছে। চলতে চলতে হঠাৎ চোখে পড়ল দূরে গাছের ডালে একটা নীলকণ্ঠ পাখি বসে রয়েছে, গাড়ি থামিয়ে ছবি তুললাম তবে ভালো এলোনা। চলার পথে দেখলাম ব্রাউন শ্রাইক, গ্রিন পিজিয়ন, স্পটেড ডাভ। কাঁকরাঝোরে এমন কিছু দেখার নেই, তবে রাস্তার ধারের চিত্রপটটা খুবই সুন্দর। এরপর আমরা কাঁকরাঝোর থেকে ফিরতি পথে পানিহাটি থেকে ডানদিকের রাস্তা ধরে চলে এলাম চিল্কিগড় রাজবাড়ি। রাজবাড়ি দেখে চলে গেলাম কনক দুর্গার মন্দির। এক সামন্ত রাজা এই মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন - ডুলুং নদীর ধারে ঘন জঙ্গলের মধ্যে। এই অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় পিকনিক স্পট। দেখলাম প্রচুর টুরিস্ট এসেছে নদীর ধারে পিকনিক করতে। মন্দির চত্বরে খুব হনুমানের উৎপাত লক্ষ্য করলাম। পরের গন্তব্য বিখ্যাত ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি। বর্তমানে নীচের কুড়িটি রুম নিয়ে গড়ে উঠেছে হেরিটেজ হোটেল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা

নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরের আমলে এই রাজবাড়ি তৈরি হয়েছিল। রাজবাড়ির কাঠামো গথিক ও মুসলিম কারুকার্যের আদলে গড়ে উঠেছে। এখানে অনেকটা সময় এলোমেলো ঘুরে কাটিয়ে দিলাম।
ুব খিদেও পেয়ে গেছে। শহরে ফিরে এসে একটা হোটেলে দুপুরের আহার সারলাম। এবারে শেষ দর্শনীয় স্থান মিনি জু। টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম চিড়িয়াখানা দেখতে। দেখা হল বার্কিং ডিয়ার, ময়ূর, উদ্‌বিড়াল, পাহাড়ি ময়না, কাকাতুয়া, শামুকখোল এবং আরও পশুপাখি।
রাঙামাটির দেশকে বিদায় জানিয়ে এবার ফেরার পালা।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের কম্পিউটার অপারেটার পলাশ পান্ডা-র শখ ফোটোগ্রাফি ও বেড়ানো।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher